POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্- তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।’ তুমি বল, ‘আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন? (আল মায়েদা: ১৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 46

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 16 Nov, 2023 1 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর বাণী

অসুস্থ ব্যক্তি বাহনে চড়ে তোয়াফ করবে।

১৬৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহ্‌র তোয়াফ করছিলেন আর তিনি উটের উপর আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) যখন হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) –এর সামনে আসতেন, তখন তিনি নিজের হাতে থাকা একটি বস্তু দ্বারা সেটির দিকে ইঙ্গিত করতেন আর আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতেন।

১৬৩৩) হযরত উম্মে সালমা (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে নিজের অসুস্থতার কথা জানালে তিনি বললেন, উটে চেপে লোকেদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর। আমি তওয়াফ করলাম আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন। তিনি সুরা ‘ওয়াততুরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর’ তিলাওয়াত করছিলেন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন:১৬৩২ নম্বর হাদীসে অসুস্থতার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু আবু দাউদ (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর পক্ষ থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেখানে এই শব্দ রয়েছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থ অবস্থায় মক্কা আসেন। তাই তিনি উটে চড়ে তওয়াফ করেন। দূর–দূরান্ত থেকে সফর করে আসা কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়ত তার জন্য সহজসাধ্যতা রেখেছে, তাকে হজ্জের পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় নি। এমন ব্যক্তি বাহনে চড়ে তওয়াফ করতে পারে। (সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড,

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৬ই অক্টোবর ২০২৩

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত

জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা সেই ঈমান সৃষ্টি কর যা আবু বকর (রা.) এবং সাহাবাগণের ঈমান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কেননা, সেই ঈমান সংশয়মুক্ত, এর মাঝে ধৈর্য রয়েছে এবং বহু আশিস ও কল্যাণের কারণ।

অপরদিকে নিদর্শন দেখার পর মান্য করা এবং ঈমান আনা ঈমানকে শর্তযুক্ত করে দেয়। এই ঈমান দুর্বল এবং সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

হযরত আবু বকর (রা.) এর ঈমান

লিখিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)একবার বাণিজ্য থেকে ফিরে আসেন– মক্কায় তখনও পৌঁছাননি, পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন নতুন সংবাদ আছে কি? সে বলল, নতুন সংবাদ তো নেই, অবশ্য তোমার বন্ধু পয়গম্বর হওয়ার দাবি করেছে। আবু বাকার (রা.) সেখানে দাঁড়িয়েই বললেন, সে যদি এমন দাবি করে থাকে তবে তা সত্য। তাই তিনি মক্কা পৌঁছনো মাত্রই রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,‘আপনি কি সত্যিই পয়গম্বর হওয়ার দাবি করেছেন?’ আঁ হযরত (সা.) বললেন,‘ হ্যাঁ, সত্যি।’ তিনি (রা.) সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য আবু বকরের কোন নিদর্শনের প্রয়োজন হয় নি। সেই সব লোক নিদর্শন দেখার বাসনা রাখে যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে না। কিন্তু যার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় হয়ে যায় তার আর নিদর্শন দেখার প্রয়োজন বা বাসনা থাকে না। এই কারণেই হযরত আবু বকর (রা.) নিদর্শন দেখতে চান নি। কেননা তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সকল অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি ভাল করে জানতেন যে আঁ হযরত (সা.) একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, মিথ্যাবাদী ও বানোয়াটকারী নন, যিনি কখনো কারো বিষয়ে মিথ্যা বানোয়াট করেন না, তিনি কখনোই আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে মিথ্যা বানোয়াট করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারেন না।

অতএব, স্মরণ রাখা উচিত যে, নিদর্শন কেবল এই কারণে চাওয়া হয় যেখানে এমন সম্ভাবনার আশঙ্কা থাকে যে, হয়তো মিথ্যা বলছে, কিন্তু যখন একথা ভালভাবে জানা থাকে যে দাবিদার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, তখন নিদর্শন দেখার কোন প্রয়োজন থাকে না। একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যারা নিদর্শন দেখার আকাঙ্খা রাখে এবং পিড়াপিড়ী করে, তাদের ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় না, বরং সর্বক্ষণ তাদের ঈমানের জন্য বিপদের আশঙ্কা থাকে। অদৃশ্যে ঈমান আনয়নের ফল তারা পায় না, কেননা, অদৃশ্যে ঈমান আনয়নের মধ্যে সুধারণা পোষণ বা সংশয়মুক্ত থাকাও একটি শর্ত; ত্বরাপরায়ণরা এর থেকে বঞ্চিত থাকে, যারা নিদর্শন দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে। এবং জোর করে। মসীহর শিষ্যরা ‘মায়েদা’ (খাবারের টেবিল) অবতরণের জন্য পিড়াপিড়ী করলে খোদা তা'লা তাদেরকে ‘মায়েদা’ দেন এবং বলেন, আমরা তো ‘মায়েদা’ অবতীর্ণ করব, কিন্তু ‘মায়েদা’ অবতরণের পর যারা অস্বীকার করবে, তাদের কঠোর শাস্তি নেমে আসবে। কুরআন শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ থেকে যে লাভ পাওয়া যায় যাতে বোঝানো যায় যে, সর্বোৎকৃষ্ট ঈমান কোনটি। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তা একদিকে যেমন অস্বীকারকারীদের জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তেমনি অপরদিকে ঈমানআনয়নকারী জাতির জন্য পরীক্ষা স্বরূপ অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এই কারণে এর মধ্যে এমন কিছু বিষয় থাকে যার সঙ্গে পরীক্ষা থাকে। আর নিদর্শন প্রার্থীরা স্বভাবতই ত্বরাপরায়ণ হয়ে থাকে, তারা কখনই সংশয়-মুক্ত থাকে না, তাদের প্রকৃতিতে সর্বক্ষণ এক আশাঙ্কা ও সংশয় তৈরীর উপাদান থাকে। সেই কারণেই তো তারা নিদর্শন প্রার্থনা করে। তাই তারা যখন নিদর্শন দেখে, তখন অযৌক্তিকভাবে সেগুলির ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, কখনও সেগুলো জাদু বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত করে। বস্তুত তাদের সংশয়বাদিতাই তাদেরকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। অতএব, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা সেই ঈমান সৃষ্টি কর যা আবু বকর (রা.) এবং সাহাবাগণের ঈমান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কেননা, সেই ঈমান সংশয়মুক্ত, এর মাঝে ধৈর্য রয়েছে এবং বহু আশিস ও কল্যাণের কারণ। অপরদিকে নিদর্শন দেখার পর মান্য করা এবং ঈমান আনা ঈমানকে শর্তযুক্ত করে দেয়। এই ঈমান দুর্বল এবং সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু মানুষ যখন সংশয়মুক্ত হয়ে ঈমান আনে, তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন ঈমান আনয়নকারীকে সেই নিদর্শন দেখান যা তার ঈমান বৃদ্ধি এবং বক্ষ উন্মোচনের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকেই নিজের নিদর্শনে পরিণত করেন। এই কারণেই কোন নবী মানুষের দাবি মেনে নিদর্শন দেখান নি। সত্যিকার মোমেনের উচিত, নিজেদের ঈমানের ভিত্তি নিদর্শন দেখার উপর না রাখা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু সুন্নত নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা সম্পর্কে চানতে চাইলে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: হাদীস শরীফে যেভাবে ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু হাদীসে, বিশেষকরে সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে এই ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না যে, সুন্নতের চার রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই পড়তে হবে। এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মাঝেও মতভেদ রয়েছে। যেমন, মালেকী এবং হাম্বলী মতবাদের লোকেরা সুন্নতের প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে অথচ হানাফী এবং শাফেয়ী (মতবাদের লোকেরা) তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের কোনো অংশই পাঠ করে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর মতে এক্ষেত্রে ফরয ও সুন্নত নামাযের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেভাবে ফরয নামাযের কেবল প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা হয়, একইভাবে সুন্নত নামাযেরও কেবল প্রথম দুই রাকাতেই সূরা ফাতিহার পর পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করতে হবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করেই নামায শেষ করা হবে। আর আমার মতামতও এটিই।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে সম্প্রতি কোনো দেশে রজম (বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার) শাস্তি কার্যকর করার উল্লেখ করে জানতে চান যে, বর্তমান যুগে রজম এর শাস্তি কার্যকর করা কি সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ই মার্চ, ২০১৯ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: ইসলামী শিক্ষামালার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে, এই শিক্ষা কোনো যুগ বা দেশের জন্য নির্ধারিত নয় বরং বিশ্বব্যাপী এবং চিরস্থায়ী। তবে, ইসলামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান সম্পর্কে সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, সাধারণত এর দুটি দিক রয়েছে, একটি চরম শাস্তি আর অপরটি তুলনামূলকভাবে কম শাস্তি। আর এসব শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হল মন্দকে প্রতিহত করা এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

কাজেই, উভয় পক্ষের সম্মতিতে যদি ব্যভিচার হয় আর তা যদি ইসলামী রীতি মোতাবেক সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে উভয়কে একশ' বেত্রাঘাত করার শাস্তির নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা হয় এবং তাতে চরম বর্বরতা ও নিপীড়নের আলামত পাওয়া যায়। অথবা কোনো ব্যভিচারী যদি ছোট শিশুকে নিজের লালসার শিকার বানায় এবং এরূপ ঘৃণ্য অপকর্মে জড়িত হয় তাহলে এমন ব্যভিচারীর শাস্তি শুধুমাত্র একশ' বেত্রাঘাত হতে পারে না। এমন ব্যভিচারীকে পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ মায়েদার ৩৪ নাম্বার আয়াত এবং সূরা আল্ আহযাবের ৬১ থেকে ৬৩ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার আলোকে মৃত্যুদণ্ড এবং পাথর মেরে হত্যার মতো কঠিন শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। তবে, এই শাস্তির সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র যুগের প্রশাসনকে প্রদান করা হয়েছে। আর এই শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রীকভাবে সমসাময়িক প্রশাসনের জন্য একটি পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু একই সময়ে প্রদেয় তিন তালাক, রাগান্বিত অবস্থায় দেওয়া তালাক এবং তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষীর মাসলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১ জুন, ২০১৯ তারিখের পত্রে এসব প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: কেউ যদি পুরো সচেতনতার সাথে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সেই তালাক মৌখিকভাবে দিক বা লিখিতভাবেই দিক না কেন উভয় ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে। তবে, একই সময়ে প্রদেয় তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। অতএব, হাদীসের গ্রন্থাবলিতে হযরত রুকানা বিন আব্দে ইয়াযীদের ঘটনা পাওয়া যায় যে, তিনি তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেন। পরবর্তীতে এ কারণে তার আক্ষেপ বা অনুশোচনা হয়। এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, এভাবে (এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তা) এক তালাক বলে গণ্য হবে, এছাড়া তুমি চাইলে আবার স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তনও করতে পার। অতএব, তিনি সেবার তার তালাকের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং এরপর তিনি হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তার স্ত্রীকে দ্বিতীয় এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তৃতীয় তালাক প্রদান করেন। (সুনান আবী দাউদ, কিতাবুত্ তালাক, বাব ফীল বাত্তাতি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, "একই সময়ে বা একই বৈঠকে তালাক সম্পূর্ণ হতে পারে না। তালাকের ক্ষেত্রে তিন তহুর (তথা তিনবার ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র) হওয়া আবশ্যক।

ফিকাহ্‌বিদগণ একই সময়ে তিন তালাক দিয়ে দেওয়া বৈধ করেছেন কিন্তু এর পাশাপাশি এই অবকাশও রেখেছেন যে, ইদ্দতের পর স্বামী যদি আবার তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে সেই নারী পুনরায় তার (প্রাক্তন) স্বামীকে বিয়ে করতে পারে এবং (চাইলে) অন্য কোনো পুরুষকেও বিয়ে করতে পারে।" (মলফূযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৭, ২০১৬ সালের সংস্করণ)

একইভাবে কেউ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন (মূলত) তার (স্ত্রীর) কোনো কাজে অসহ্য হয়ে কিংবা অন্যায় কাজের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্ত্রীর প্রতি আনন্দিত হয়ে কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় না। তাই এমন রাগের সময় প্রদেয় তালাকও কার্যকর হবে। তবে কোনো মানুষ যদি এমন ক্রোধান্বিত থাকে যে, তার ওপর উন্মাদনা ভর করে আর সে পরিণাম না ভেবেই তাড়াহুড়া করে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে এরপর সেই উন্মাদনার মাত্রা কেটে যেতেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারে তাহলে এমন অবস্থার জন্য পবিত্র কুরআন বলেছে যে,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ
وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

(সূরা আল্ বাকারা: ২২৬) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা শপথের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তর (পরিকল্পিতভাবে যে পাপ) করে, সে জন্য তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন। সত্য কথা হল, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল (এবং) পরম সহিষ্ণু।

তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষীর যতটুকু সম্পর্ক, এর কারণ হল; বিবাদের ক্ষেত্রে মীমাংসা করতে যেন সুবিধা হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি তালাক কার্যকর করার ক্ষেত্রে একমত হয় এবং তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত না থাকে তাহলে সাক্ষী ছাড়াও এমন তালাক কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। কাজেই তালাকের ক্ষেত্রে সাক্ষী থাকাটা মুস্তাহাব (বা পছন্দনীয়, হলে ভাল; না হলে সমস্যা নেই), আবশ্যক নয়। অতএব পবিত্র কুরআন তালাক এবং ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে যেখানে সাক্ষীর উল্লেখ করেছে সেখানে এটিকে উপদেশ আখ্যা দিয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে,

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْ
فٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ
يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۬ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

(সূরা আত্ তালাক: ৩) অর্থাৎ, এরপর যখন মহিলারা তাদের নির্ধারিত ইদ্দতকালের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের রাখো অথবা যথাযথভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও। আর তোমাদের মাঝ থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ (ব্যক্তিকে) সাক্ষী রাখো এবং আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাকে এ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে তিনি তার জন্য (নিষ্কৃতির) কোনো না কোনো পথ উন্মুক্ত করে দিবেন।

অতএব, চারজন ফিকাহ্‌বিদই এ বিষয়ে একমত যে, যদি কোনো ব্যক্তি সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়াই তালাক দিয়ে দেয় অথবা (পুনরায় স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার তালাক বা ফিরিয়ে নেওয়ায় কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার পর ('সাদাকাল্লাহুল আযীম') বাক্য পাঠ করার বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে (হুযুরের) নির্দেশনা কামনা করেছেন। গত ১১ই জুন, ২০১৯ তারিখের পত্রে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: আমি এ সম্পর্কে গবেষণা করিয়েছি। আলেমদের মধ্যে উভয় প্রকার মতামত পাওয়া যায়। যারা এটি (পাঠ করার) বৈধতায় বিশ্বাসী তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে এর বৈধতার উপায় বের করেছেন। আমার মতেও কেউ যদি

এরপর ৮ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

প্রথমত আসমা এবং আবু আফাক ইহুদীর হত্যার ঘটনা রেওয়ায়েত এবং দেরায়েত অনুসারে প্রমাণিত হয় না। আর তর্কের খাতিরে এই ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিলেও সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা আপত্তিজনক হিসেবে বিবেচিত হত পারে না।

আসমা ও আবু আফাকের হত্যার উল্লেখ কোনো হাদীসে না পাওয়া এবং প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্য হতে কতেক ঐতিহাসিকেরও এ বিষয়ে নিরব থাকা এ বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত করে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং কোনোভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে এর অনুপ্রবেশ ঘটে তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে।

যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন- এ ঘটনা সঠিক সাব্যস্ত হয় না এবং এমন মনে হয় যে, হয় কোনো গোপন শত্রু কোনো মুসলমানের প্রতি আরোপ করে এ ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছে আর তারপর তা মুসলমানদের রেওয়ায়েতে অনুপ্রবেশ করেছে, অথবা কোনো দুর্বল মুসলমান নিজ গোত্রের প্রতি এই মিথ্যা গর্ব আরোপের জন্য যে, এর সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা কতক ভয়াবহ কাফেরকে হত্যা করেছিল- এসব রেওয়ায়েত ইতিহাসে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন।

জ্বালাময়ী কবিতার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)কে হত্যার বিষয়ে প্ররোচনা দানকারী ইসলামের শত্রু আবু আফাক ইহুদীর হত্যার ঘটনার বিশ্লেষাত্মক বর্ণনা

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যুগ-ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পরখ করে এবং এর প্রকৃত বিষয় বুঝে এরপর বর্ণনা করার চেষ্টা করি। মহানবী (সা.)-এর সত্তার প্রতি যে অপবাদই আরোপিত হোক না কেন-তা খণ্ডন করার চেষ্টা করি।

মৃত্যুসংবাদ, স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব:

প্রফেসর ডক্টর নাসের আহমদ খান সাহেব আল মারুফ পারভেজ পারওয়াজি (কানাডা), মাননীয় শরীফ আহমদ ভাট্টি সাহেব (রাবোয়া), প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহেরি সাহেব (সাবেক আমীর জামাত, জেলা-নবাবশাহ) এবং প্রফেসর ডক্টর মহম্মদ শরীফ খান সাহেব (যুক্তরাষ্ট্র)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৫তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আসমা'র মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, আর আমি বলেছিলাম যে, একই ধরনের আরো একটি ঘটনা রয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাও কেবল একটি মনগড়া গল্প বলে মনে হয়। এই দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আবু আফাক ইহুদীর হত্যা সংক্রান্ত। এখানে লেখা আছে যে, সীরাত গ্রন্থসমূহে আরেকটি কাল্পনিক ঘটনা আবু আফাক ইহুদীকে হত্যার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের বলেন, কে আমার পক্ষ হয়ে এই কুচক্রী অর্থাৎ আবু আফাককে সামলাবে? অর্থাৎ কে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারবে বা তাকে হত্যা করতে পারবে? এই ব্যক্তি অর্থাৎ আবু আফাক অনেক বেশি বয়োবৃদ্ধ মানুষ ছিল। বলা হয় যে, তার বয়স ১২০ বছর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি মানুষকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত আর নিজ কবিতায় মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলতো ও অবমাননাকর আচরণ প্রদর্শন করত। মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশে হযরত সালেম বিন উমায়ের ওঠেন, তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা খোদা তা'লার ভয়ে অনেক কাঁদতেন। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নিবেদন করেন, আমি মানত করছি যে, হয় আমি আবু আফাককে হত্যা করব অথবা এই চেষ্টায় নিজ প্রাণ বিসর্জন দিবো। এরপর হযরত সালেম বিন উমায়ের সুযোগের সন্ধানে থাকেন। একরাতে প্রচণ্ড গরম ছিল আর আবু আফাক নিজের ঘরের বাইরে আঙিনায় ঘুমিয়ে ছিল। হযরত সালেম একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে হযরত সালেম নিজ তরবারি আবু উফকের কলিজার ওপর রেখে পুরো জোরে চাপ দেন। এমনকি সেই তরবারি তার পেট চিরে বিছানায় গেঁথে যায়। একইসাথে খোদার শত্রু আবু আফাক এক প্রচণ্ড চিৎকার দেয়। হযরত সালেম তাকে সেই অবস্থায় রেখেই সেখান থেকে চলে আসেন। আবু উফকের চিৎকার শুনে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ দৌড়ে আসে। আর তার কতিপয় সঙ্গী তখনই তাকে উঠিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। কিন্তু খোদার এই শত্রু উক্ত আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি আর মারা যায়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০০)

এই ঘটনাটি একটি সীরাত গ্রন্থে এভাবেই লেখা হয়েছে। এই ঘটনাটিও কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। সিহাহ্ সিত্তাহ্তেও এটির উল্লেখ নেই।

যদিও কতিপয় সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেমন-সীরাত হালাবিয়া, শারাহ যুরকানী, তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সা'দ, সীরাতুন নবভীয়া ইবনে হিশাম, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, কিতাবুল মাগাযী আল-ওয়াকদী এবং সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ ইত্যাদিতে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। উদাহরণস্বরূপ আল-কামেল ফিত্-তারীখ, তারীখে তাবারী, তারীখ ইবনে খলদুন ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের অন্য কতিপয় গ্রন্থে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, তারিখুল খামিস গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনা সম্পর্কেও, আসমার ঘটনার ন্যায় বলা হয়ে থাকে যে, সে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতা ও বিরোধিতায় মানুষকে উত্তেজিত করত। বদরের যুদ্ধের পর সে হিংসা ও বিদ্বেষে আরও সীমাতিক্রম করে আর প্রকাশ্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আবু আফাকের তথাকথিত হত্যাসংক্রান্ত রেওয়ায়েতের আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যও এই ঘটনাকে সন্দেহপূর্ণ করে তোলে। যেমন,প্রথমত হত্যাকারীর বিষয়ে মতভিন্নতা। ইবনে সা'দ ও ওয়াকদীর মতে আবু উফকের হত্যাকারী ছিলেন সালেম বিন উমায়ের। অথচ অন্য কতিপয় রেওয়ায়েতে সালেম বিন উমরের উল্লেখ রয়েছে, আবার ইবনে উকবার মতে সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবেত আনসারী তাকে হত্যা করেন। দ্বিতীয়ত হত্যার কারণ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং ওয়াকদীর মতে সালেম স্বয়ং উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেন, অথচ কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

(শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৮৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৩)

ইবনে হিশামে এমনটিই লেখা আছে। তৃতীয় বিষয়টি হলো ধর্মীয় মতবিরোধ সংক্রান্ত। ইবনে সা'দের মতে আবু আফাক ইহুদী ছিল, অথচ ওয়াকদীর মতে সে ইহুদী ছিল না।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৩)

এছাড়া হত্যার যুগ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। ওয়াকদী ও ইবনে সা'দের মতে এই ঘটনাটি আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যার পরের ঘটনা। অথচ ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম প্রমুখের মতে এই ঘটনাটি আসমার হত্যার পূর্বের ঘটনা।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ:২০- ২১) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকিদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬১,১৬৩) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৮৬-৮৮৭)

এসব স্পষ্ট মতভিন্নতা থেকেও একথা স্পষ্ট যে, এটি কেবল বানোয়াট ও মিথ্যা গল্প, এর কোনো বাস্তবতা নেই। তর্কের খাতিরে যদি আবু আফাকের নিহত হওয়ার কথা মেনেও নেওয়া হয় তাহলেও তার অন্যান্য অপরাধ- দেশের প্রধানকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করা, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা পাঠ করে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেওয়া, সর্বসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করা আর যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করাই মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট । আজও এগুলোর জন্য বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কেবল গালমন্দ করা এই হত্যার কারণ হতে পারে না। অনুরূপভাবে আসমার ঘটনার ন্যায় এখানেও আবু আফাকের হত্যার পর ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন প্রমাণিত হয় না।

ইহুদীদের তার হত্যার কারণে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ার কথা প্রমাণ হয় না। সুতরাং তাদের নিশ্চুপ থাকা উক্ত ঘটনার বানোয়াট হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য দলিল। একথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, বলা হয়ে থাকে, এসব ঘটনা বদরের পূর্বে বা বদরের অব্যবহিত পর ঘটেছে। সব ঐতিহাসিকের ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসলমান ও ইহুদীদের প্রথম লড়াই হলো বনু কায়নুকার যুদ্ধ। যদি বদরের পূর্বেও কোনো ঘটনা ঘটতো তাহলে এর নীচে অবশ্যই উল্লেখ করতো যে, এভাবে ঘটনা ঘটেছে। আর ইহুদীরা আবু আফাক ও আসমার হত্যার ঘটনার ভিত্তিতে বৈধভাবে মুসলমানদের ওপর এই আপত্তি করতে পারতো যে, মুসলমানরা কার্যত প্রথমে তাদের উত্যক্ত করেছে। কিন্তু কোথাও এই উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, মদীনার ইহুদীরা এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখনো এমন কোনো প্রশ্ন তুলেছে।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আসমা ও আবু আফাকের হত্যার মনগড়া ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা বর্ণনা করেছেন তা এরূপ: ওয়াকদী এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের পরের এমন দুটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে যেগুলোর হাদীসগ্রন্থ ও ইতিহাসের সঠিক রেওয়ায়েত সমূহে কোনো উল্লেখ নেই। দেরায়েতের দিক থেকেও যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে সেগুলো সঠিক প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যেহেতু এগুলোর মাধ্যমে আপাত দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে একটি আপত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয় তাই কতিপয় খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক অভ্যাসবশত একান্ত অসহনীয় রূপে এগুলোর উল্লেখ করেছে। এসব মনগড়া ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মদীনায় আসমা নামের এক নারী বাস করতো; [আসমার উল্লেখ এখানে পুনরায় আসছে;] সে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ শত্রু ছিল। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার করতো এবং নিজের উস্কানিমূলক কবিতার মাধ্যমে মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক উত্যক্ত করত এবং তাঁকে হত্যা করতে উস্কানি দিতো। অবশেষে এক অন্ধ সাহাবী উমায়ের বিন আদী উত্তেজিত হয়ে রাতের বেলা তার ঘরে গিয়ে সে ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। যখন মহানবী (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করেন নি, বরং বলা হয়ে থাকে যে, এক প্রকার তার কাজের প্রশংসা করেন। [কাজের প্রশংসা করেছেন বলতে এটি বোঝায় না যে, বাস্তবেই তা করেছেন; কেননা এই ঘটনা যে অলীক তা আমি সাব্যস্ত করে এসেছি।]দ্বিতীয় যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, আবু আফাক নামের এক বৃদ্ধ ইহুদী মদীনায় বাস করতো। সে-ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কবিতা শুনাতো এবং কাফেরদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাঁকে হত্যা করতে উত্তেজিত করতো। বলা হয় যে, অবশেষে তাকেও একদিন সালেম বিন উমায়ের নামের একজন সাহাবী রাগান্বিত হয়ে রাতের বেলা তার বাড়ির আঙ্গিনায় হত্যা করেন। ”

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,ওয়াকদী এবং ইবনে হিশাম উস্কানিমূলক কিছু পঙক্তিও সংকলন করেছেন যা আসমা এবং আবু আফাক মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শোনাতো। এই দুটি ঘটনাকে স্যার উইলিয়াম মিউর প্রমুখ ব্যক্তি অত্যন্ত অরুচিকরভাবে উল্লেখ করে নিজেদের পুস্তকের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। এই প্রাচ্যবিদরা এই ঘটনাগুলো পুঁজি করে অজুহাত দাঁড় করিয়েছে যে, দেখ, কীরূপ অন্যায় হয়েছে! কিন্তু আসল কথা হলো, বিচার বিশ্লেষণ করলে এসব ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয় না।

এগুলোর সঠিক হওয়া সম্পর্কে প্রথম যে প্রমাণটি সন্দেহ সৃষ্টি করে তার তা হলো, হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এসব ঘটনার উল্লেখ (পর্যন্ত) পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনো হাদীস গ্রন্থে হন্তারক কিংবা নিহত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয় নি। বরং হাদীস তো দূরের কথা, কোনো কোনো ঐতিহাসিকও এর উল্লেখ করেন নি। অথচ এধরনের ঘটনা যদি বাস্তবেই ঘটে থাকতো তাহলে হাদীসের গ্রন্থাবলী এবং কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ না করার কোনো কারণ ছিল না। যেহেতু এসব ঘটনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর এক ধরনের আপত্তি দেখা দেয় তাই হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিকরা এসব ঘটনা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকেন- এমন সন্দেহ করার এখানে কোনো সুযোগ নেই। কেননা প্রথমত, যে পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনা ঘটেছে তা আপত্তিকর নয়। যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে- তাহলে এমন ঘটনা ঘটলেও তা আপত্তিকর নয়। কাজেই একথা বলা যে, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে তাই ঐতিহাসিকরা এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি- একথা ভুল। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি হাদীস ও ইতিহাসের সামান্যতম জ্ঞান রাখে তার কাছে এটি অজানা নয় যে, মুসলমান হাদীস বিশারদ এবং ঐতিহাসিকরা কখনো কোনো রেওয়ায়েত কেবলমাত্র ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আপত্তি বর্তানোর ভয়েসংকলন করা পরিত্যাগ করেন নি। এর কারণ হলো, তাদের স্বীকৃত রীতি ছিল, যে বিষয়টি তারা রেওয়ায়েত অনুসারে সঠিক দেখতেন তা সংকলন করার ক্ষেত্রে সেটির বিষয়বস্তুর কারণে কিঞ্চিত দ্বিধাও করতেন না। বরং তাদের মধ্যে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের রীতি ছিল- মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে যে কথাই তাদের সামনে আসতো তা রেওয়ায়েত ও দেরায়েত তথা বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বিষয়ের নিরিখে দুর্বল হলেও আর বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের নীতি অনুসারে এসব বর্ণনা ও বর্ণিত বিষয় সঠিক নাকি ভুল- তার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ ওলামা এবং পরবর্তী যুগের বিশ্লেষকদের হাতে ছেড়ে দিতেন। আর এমনটি করার পেছনে তাদের এই অভিপ্রায় থাকতো যে, কোনো বিষয় যা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি আরোপিত হয়- তা সঠিক হোক বা ভুল,সংকলন থেকে যেন তা বাদ না পড়ে। এ কারণেই ইতিহাসের প্রাথমিক গ্রন্থাবলীতে ভালোমন্দ সকল প্রকার তথ্যভাণ্ডার সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, সেগুলো সব গ্রহণযোগ্য; বরং এখন সেগুলোর মধ্য থেকে দুর্বল বর্ণনাগুলোকে সঠিক বর্ণ না থেকে পৃথক করা আমাদের দায়িত্ব।

যাহোক, এ বিষয়ে তিল পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলমান হাদীস বিশারদ অথবা ঐতিহাসিক কখনো কোনো রেওয়ায়েতকে শুধুমাত্র এ কারণে প্রত্যাখ্যান করেন নি যে, বাহ্যত (তা) মহানবী (সা.) অথবা সাহাবীদের মর্যাদা পরিপন্থী কিংবা এর ফলে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয়। যেমন কা'ব বিন আশরাফ ও আবু রাফে' ইহুদীকে হত্যার ঘটনা যা আসমা ও আবু আফাকের তথাকথিত হত্যার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে ও পুরোপুরি বর্ণিত হয়েছে এবং কোনো মুসলমান রাবী অথবা হাদীস বিশারদ কিংবা ঐতিহাসিক তাদের রেওয়ায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। এমতাবস্থায় আসমা ও আবু আফাকের হত্যার

উল্লেখ কোনো হাদীসে না পাওয়া এবং প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্য হতে কতেক ঐতিহাসিকেরও এ বিষয়ে নীরব থাকা এ বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত করে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং কোনোভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে এর অনুপ্রবেশ ঘটে তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে।

এছাড়া এসব ঘটনার খুঁটিনাটি যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এর বানোয়াট হওয়া আরো নিশ্চিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আসমার ঘটনায় ইবনে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে হন্তারকের নাম উমায়ের বিন আদী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীতে ইবনে দুরায়েদ-এর রেওয়ায়েতে হত্যাকারীর নাম উমায়ের বিন আদী নয় বরং গিশমীর উল্লেখ করা হয়েছে। সুহায়লী এই উভয় নামকে ভুল আখ্যায়িত করে বলে যে, মূলত আসমাকে তার স্বামী হত্যা করেছিল যার নাম বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ইয়াযীদ বিন যায়েদ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কতক রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখিত হয়েছে যে, উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ-ই আসমার হত্যাকারী ছিলো না, বরং তার হত্যাকারী তারই গোত্রের এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছিল। নিহত ব্যক্তির নাম ইবনে সা'দ প্রমুখগণ আসমা বিনতে মারওয়ান উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর উক্তি অনুসারে সে আসমা বিনতে মারওয়ান ছিল না, বরং উমায়ের তার বোন বিনতে আদীকে হত্যা করেছিল। ইবনে সা'দ হত্যার সময় মধ্যবর্তী রাত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যুরকানীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দিন অথবা বেশি হলে রাতের প্রথম প্রহর প্রমাণিত হয়। কেননা সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তি তখন খেজুর বিক্রি করছিল।" [এই পুরো বিবরণ আমি আগেও বর্ণনা করেছি।]

এরপর দ্বিতীয় ঘটনা যার বর্ণনা এখন চলছে, তা আবু আফাকের হত্যার ঘটনা। এক্ষেত্রে ইবনে সা'দ এবং ওয়াকদী প্রমুখ হত্যাকারীর নাম সালেম বিন উমায়ের লিখেছেন, কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তার নাম সালেম বিন আমর বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে উক্‌বা সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। একইভাবে নিহত আবু আফাক সম্পর্কে ইবনে সা'দে লিখিত রয়েছে যে, সে ইহুদী ছিল; কিন্তু ওয়াকদী তাকে ইহুদী বলে নি। এরপর ইবনে সা'দ এবং ওয়াকদী উভয়ের ভাষ্যমূলে জানা যায় যে, সালেম স্বয়ং উত্তেজিত হয়ে আবু আফাককে হত্যা করেছিল; কিন্তু একটি রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যার যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে জানা যায়, ইবনে সা'দ ও ওয়াকদী এই (ঘটনাকে) আসমাকে হত্যার পরে ঘটেছে বলে উল্লেখ করে, কিন্তু ইবনে ইসহাক ও আবু রবী এই ঘটনাকে আসমার হত্যার পূর্বের ঘটনা বলে থাকেন। এসব মতপার্থক্য এই ঘটনা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, এই ঘটনা মনগড়া ও বানোয়াট। আর এতে যদি কোনো সত্যতা থাকে তবে তা এমন রহস্যাবৃত যারসম্পর্কে বলা অসম্ভব যে, তা (আসলে) কী এবং কোন পর্যায়ের।

এই দুটি ঘটনা ভ্রান্ত হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো, এই উভয় ঘটনার যুগ তা বর্ণনা করা হয়েছে যার সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, সে সময় পর্যন্ত মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় নি। যেমন ইতিহাসে বনু কায়নু কার যুদ্ধ সম্পর্কে একথা সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘটিত এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল এবং বনু কায়নু কাই সর্বপ্র থম ইহুদী (গোত্র) ছিল যারা ইসলামের শত্রুতায় প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল। অতএব এটি কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এই যুদ্ধের পূর্বেইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের হত্যা ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া যদিবনু কায়নুকার যুদ্ধের পূর্বে এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকত তাহলে এই যুদ্ধের কারণসমূহেরবিবরণে এ ঘটনার উল্লেখ থাকবে না- এমনটি হতেই পারে না। যুদ্ধের যে-সব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এসব ঘটনার উল্লেখ নেই। লেখা উচিত ছিল যে, এভাবে আমাদের দু ই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। কমপক্ষে এতটুকু (লেখা) তো আবশ্যক ছিল যে, ইহুদী- যারা কিনা এসব ঘটনার ভিত্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের একটি আপাত সুযোগ নিতে পারতো যে, কার্যত মুসলমানরাই প্রথমে তাদের উত্তেজিত ও উত্যক্ত করেছে- তাদেরএসব ঘটনা সম্পর্কে হা-হুতাশ করার কথা। কিন্তু কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এমনকি যেসব ঐতিহাসিক এ গল্প বর্ণনা করেছেন, তাদের পুস্তকসমূহেও ঘুণাক্ষরেও একথার উল্লেখ নেই যে, মদীনার ইহুদীরা কখনো কোনো আপত্তি করেছে। কোনো ব্যক্তির যদি এ ধারণা জাগেযে, হয়ত তারা আপত্তি উঠিয়ে থাকবে কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকরা এর উল্লেখ করে নি- তবে তা হবে নিতান্ত ভুল ও ভিত্তিহীন চিন্তা। কেননা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো কোনো মুসলমান মুহাদ্দিস কিংবা ঐতিহাসিক বিরুদ্ধবাদীদের কোনো আপত্তি গোপন করেননি। উদাহরণস্বরূপ, নাখলার অভিযান সংক্রান্ত ঘটনাতে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আশহুরে হুরুম (তথা সম্মানিত মাস)-এর অবমাননা করার অপবাদ আরোপ করলে মুসলমান ঐতিহাসিকরা পরম বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে সেই আপত্তিকে নিজেদের পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব এ পরিস্থিতিতেও যদি ইহুদীরে পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি করাহতো তবে ইতিহাস সেটি উল্লেখ না করে থাকত না। মোটকথা, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন- এ ঘটনা সঠিক সাব্যস্ত হয় না এবং এমন মনে হয় যে, হয় কোনো গোপন শত্রু কোনো মুসলমানের প্রতি আরোপ করে এ ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছে আর তারপর তা মুসলমানদের রেওয়ায়েতে অনুপ্রবেশ করেছে, অথবা কোনো দুর্বল মুসলমান নিজ গোত্রের প্রতি এই মিথ্যা গর্ব আরোপের জন্য যে, এর সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা কতক ভয়াবহ কাফেরকে হত্যা করেছিল- এসব রেওয়ায়েত ইতিহাসে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এটি হলো সেই ঘটনাবলির প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু যেভাবে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে,এসব ঘটনা যদি সত্যও হয় তবুও যে অবস্থায় সেগুলো সংঘটিত হয়েছে সেসব অবস্থা বিবেচনায় সেগুলোকে আপত্তিকর বলা যেতে পারে না। সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের যে স্পর্শকাতর অবস্থা ছিল তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় ছিল যে এমন এক জায়গায় পড়ে যায় যার চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ভয়ঙ্কর আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে এবং তার বাইরে বের হওয়ারও কোনো পথ খোলা থাকে না, আবার তার কাছে তারা দাঁড়িয়ে থাকে যারা তার জীবনের শত্রু। মুসলমানদের এমন স্পর্শকাতর অবস্থায় কোনো দুষ্ট ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি যদি তাদের মনিব ও নেতার বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কবিতা শুনিয়ে লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো এবং তাকে হত্যার করার ব্যাপারে শত্রুদের উৎসাহিত করতো তবে সে যুগের অবস্থার নিরিখে এর চিকিৎসা সে ব্যক্তিকে হত্যা করা ছাড়া আর কী-ইবা হতে পারত! আর এ হত্যাকাণ্ডওমুসলমানদের পক্ষ থেকে চরম উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকবে যে অবস্থায় সামান্য হত্যাকাণ্ডকে কিসাস-এর যোগ্য মনে করা হতো না। দেখুন! মিস্টার মার্গোলিসের মতো ব্যক্তি যিনি একজন প্রাচ্যবিদ এবং প্রত্যেক বিষয়ে সাধারণত বিরোধিতাই করে থাকেন- এসব ঘটনার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তিরস্কারের যোগ্য মনে করেন না। যেমন মিস্টার মার্গোলিস লিখেন,

"আসমা যেহেতু তার প্রতি আরোপিত পঙক্তিতে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুদের কার্যত উস্কে দিচ্ছিল তাই পৃথিবীর যে-কোনো মানদণ্ডে তার হত্যাকে একটি অযৌক্তিক ও বর্বরোচিত আচরণ গণ্য করা যেতে পারে না। আর একথাও স্মরণ রাখা উচিতযে, উস্কানির সে রীতি যা ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা আবৃতির আদলে অবলম্বন করা হয়েছিল তা আরবের মতো দেশে অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনার কারণ হতো। আর কেবল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি সে যুগের আরবে প্রচলিত রীতিনীতির বর্তমানে মহান একটি পদক্ষেপ। শুধুমাত্র অপরাধীকে হত্যা করা হয়েছে, অন্য লোকদেরকে হত্যা করা হয় নি। কেননা উস্কানিমূলক কবিতার প্রভাব কেবল একক ব্যক্তিপর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত না, বরং পুরো গোত্রে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে যেত। এর পরিবর্তে ইসলামে এই সঠিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, অপরাধের শাস্তি কেবল অপরাধীর পাওয়া উচিত, তার আত্মীয়স্বজনদের নয়।"

মিস্টার মার্গোলিসের যদি এসব হত্যার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থেকে থাকে তাহলে তা এর পদ্ধতি নিয়ে, অর্থাৎ কেন তাদের অপরাধের রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নি? এর প্রথম উত্তর হলো, যদি এসব ঘটনাকে সঠিক বলেও ধরে নেয়া হয় তাহলে কিছু মুসলমানের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ ছিল, যা তাদের দ্বারা উত্তেজনাকর অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এর আদেশ দেন নি, ইবনে সা'দের বর্ণনায় যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি মহানবী (সা.) -এর আদেশ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও নিঃসন্দেহে সে যুগের অবস্থা অনুযায়ী যদি আসমা এবং আবু আফাককে হত্যার ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গ্রেফতারের পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো এবং নিহতদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠরা যথাসময়ে জানতে পারত যে, তাদের লোকদের হত্যা করা হবে- তাহলে এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক হতে পারত। এছাড়া এই ঘটনাবলি

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

মুসলমান এবং ইহুদী, একইভাবে মুসলমান এবং মদীনার মুশরিকদের মাঝে এক ব্যাপক পরিসর যুদ্ধে পর্যবসিত হতে পারত।" হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মিস্টার মার্গোলিস যেখানে নিছক হত্যাকে আরবের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন সেখানে হত্যার পন্থার ব্যাপারে তার দৃষ্টি সে যুগের বিশেষ অবস্থা পর্যন্ত কেন পৌঁছাতে পারল না? তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি সে সময়ের পরিস্থিতিকে দৃষ্টিপটে রাখতেন তাহলে হয়ত তার বিশ্বাস জন্মাতো, কথার কথা- যদি হত্যার ঘটনা ঘটেও থাকতো, তাহলেও যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটাই সে সময়ের অবস্থা ও সাধারণ শান্তির জন্য যথোপযুক্ত ও জরুরি ছিল।" কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটেই নি।

"সারকথা হলো, আসমা এবং আবু আফাক ইহুদীর হত্যার ঘটনাবলি রেওয়াত (বর্ণনাকারী) ও দেরায়েত (ঘটনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য) উভয় দিক থেকেই সঠিক প্রমাণিত হয় না। যদি এগুলোকে সঠিক বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও সে যুগের অবস্থা অনুযায়ী আপত্তিকর মনে করা যেতে পারে না। আর যা-ই ঘটে থাকুক, হত্যার এই ঘটনাগুলো কিছু মুসলমানের ব্যক্তিগত কাজ ছিল যা উত্তেজনার বশে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এই বিষয়ে কোনো আদেশ দেন নি।"

[সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, (রা.), পৃ: ৪৪৬-৪৫১]

মহানবী (সা.) তাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন মর্মে আপত্তিটিই ভুল। এগুলো কল্পিত বিষয় যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। ইতিহাসবিদরা যা লিখেছেন সেগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা উচিত ছিল।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যুগ-ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পরখ করে এবং এর প্রকৃত বিষয় বুঝে এরপর বর্ণনা করার চেষ্টা করি। মহানবী (সা.)-এর সত্তার প্রতি যে অপবাদই আরোপিত হোক না কেন-তা খণ্ডন করার চেষ্টা করি।

আল্লাহ্ তা'লা এসব আলেমদেরকেও বিবেক দান করুন যারা এসব বিষয়ের প্রচলন ঘটিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে এবং ইসলামকে দুর্নাম করার চেষ্টা করে। তাদের দাবি হলো তারা ইসলামের সেবা করছে, বাস্তবে তাদের কর্মই তাদের মাঝে উগ্রতা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। তাদের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হবে প্রফেসর ডা. নাসের আহমদ খান সাহেবের যিনি পারভেজ পারওয়াজী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি কানাডায় ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মোবাল্লেগ সিলসিলাহ জনাব আহমদ খান সাহেব নাসীম; তিনি দীর্ঘদিন নায়েব ইসলাহ ও ইরশাদ মাকামী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন জামা'তকে তিনি বেশ সুসংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রহমত বিবি। পরওয়াজী সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মেট্রিকের পর কলেজে ভর্তি হন নি, কেননা তৎকালীন তা'লীমুল ইসলাম কলেজ ছিল লাহোরে অবস্থিত। এরপর কলেজ যখন রাওবয়াতে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি সেই কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে বি.এ অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে ইউনিভার্সিটি ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে এম.এ সম্পন্ন করেন আর ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রফেসর নাসের পারওয়াজী সাহেব ১৯৬০ সালে উর্দুতে এম.এ সম্পন্ন করার পর কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্তি পান এবং তিনি মুজাফফর গড়ের সরকারি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। আল-ফযল, মাসিক মিসবাহ, খালেদ ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এভাবে কাব্য-কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তা'লীমুল ইসলাম কলেজ যখন রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি ওয়াক্‌ফ করে ১৯৬১ সালে সেখানে চলে আসেন আর ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়াতে উর্দু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেন স্টাডিজের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যেখানে দায়িত্বপালনকালে তিনি পাকিস্তান এবং জাপানের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে খুব সচেষ্ট ছিলেন। টোকিওতে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ফিরে আসেন। এরপর কলেজ যখন জাতীয়করণ করা হয় তখন পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করতে থাকেন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ফয়সালাবাদ সরকারী কলেজে পাঠদান করেন। আহমদী হবার কারণে সে-যুগে তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশেষে যখন গ্রেফতার হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি এখানে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। এরপর হুযূর (রাহে.)-এর নির্দেশে সুইডেনে হিজরত করেন এবং সেখানে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন। সুইডেনে অবস্থানকালে নোবেল প্রাইজ কমিটি ফর লিটারেচারের তিনি সদস্য নিযুক্ত হন আর ১৬ বছর সেখানে তিনি দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হিজরত করে কানাডায় চলে যান। বিশ্ব-সাহিত্য ও শিক্ষার ময়দানে তাঁর নাম খুবই বিখ্যাত। তাঁর সহধর্মিনী আমাতুল মজীদ সাহেবা মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ জলীল সাহেবের কন্যা। আল্লাহ তা'লা তাঁদেরকে দু জন কন্যা সন্তান এবং তিনজন পুত্র সন্তান দান করেছেন।

তাঁর সহধর্মিনী বলেন, আমাদের ৭৩ বছরের দাম্পত্যজীবন। সব উত্থান-পতন, সুখদুঃখে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও দরিদ্রতায় তিনি খুব উত্তমভাবে সঙ্গ দিয়েছেন। আর আমি যেহেতু পিতা-মাতার বড় কন্যা ছিলাম, রাবওয়াতে ছিলাম তাই তিনি (প্রফেসর পারওয়াজী সাহেব) কখনো আমাকে তাদের (তথা পিতা-মাতার) সেবাদানে বাধা দেন নি, বরং আমার চেয়ে তিনি তাদের প্রতি বেশি যত্নবান ছিলেন। সব আত্মীয়স্বজনের সাথে অর্থাৎ আমার শ্বশুরপক্ষের সব আত্মীয়স্বজনের সাথে তার ব্যবহার ছিল আদর্শস্থানীয়। আত্মীয়সুলভ আচরণেরক্ষেত্রে এক আদর্শ ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের সকল সুখদুঃখের সাথী ছিলেন।

তাঁর ছেলে তাহের আহমদ খান বলেন, সর্বাবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল থাকতো। সদা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেছেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি খলীফাতুল মসীহর সাথে যোগাযোগ রেখেছেন এবং দোয়ার আবেদন করতে থেকেছেন। বিগত দিনগুলোতে ভীষণ অসুস্থ তায়ও যখন ডাক্তার নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং তার পক্ষে স্বহস্তে লেখাও দুস্কর ছিল তখন প্রথমে তো বার্তা পাঠাতে থাকেন, পরে কখনো কখনো স্বীয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্বল, কম্পিত হাতে আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। খুবই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার ছেলে লিখেছেন, জাপানে অবস্থানকালে আমার পিতা এনসাইক্লোপিডিয়া পুরস্কার পেয়েছিলেন যা ঐ যুগে একটি বড় পুরস্কার বলে বিবেচিত হতো। এটি তিনি খেলাফত লাইব্রেরীকে দান করেছেন। ১৯৮০-র দশকে সাহিত্যে আল্লামা ইকবাল স্বর্ণপদকও লাভ করেছিলেন। কিন্তু আহমদী হবার কারণে তাকে ডাকা হয় নি এবং তার পদকটি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তাঁর মেয়ে আমাতুল ওয়াদুদ বলেন, আমার পিতার কুরআন করীমের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন এক পারা করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, কখনো আমার কোনো প্রবন্ধ বা বক্তৃতার জন্য কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলে নিমিষে বলে দিতেন যে, অমুক সূরার অমুক আয়াতে দেখে নাও। তিনি আরো বলেন, পিতা আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা শিখিয়েছেন, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারি এবং যুগখলীফার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

তার দ্বিতীয় মেয়ে সা'দিয়া বলেন, আমার পিতা খেলাফতের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তার কথাবার্তা ও আচরণে সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের জন্য সুগভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করেছি। সর্বদা দেখতাম আমাদের পিতা প্রতিটি কাজের পূর্বে যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার আবেদন

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

জানিয়ে চিঠি লিখতেন। অসুস্থাবস্থায় শেষ দিনগুলোতে যখন ডাক্তার এসে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, নৈরাশ্যকর কথা বলেন, তখন ডাক্তার ঘর থেকে বের হওয়ার খানিক পরেই তিনি আমাকে বলেন, কাগজ-কলম নিয়ে এসো। এরপর দুর্বল ও কম্পিত হাতে দোয়ার জন্য চিঠি লিখেন যেভাবে আমি পূর্বে উল্লে খ করেছি। তিনি আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। অনেক বেশি সদকা-খয়রাত করতেন। কাছে যে টাকা-পয়সাই থাকতো তা সদকা হিসেবে দিয়ে দিতেন।

তার দৌহিত্রী নায়লা মাহমুদ বলেন, আমি আমার দাদাকে দেখেছি ও শিখেছি যে, ঈমান কী এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্র কৃত ভালোবাসা কেমন হয়ে থাকে! (দৌহিত্রী হওয়ার অর্থ হলো, তিনি তার নানা হবেন। তার পিতার নাম জাফর মাহমুদ।) তিনি বলেন, আমি তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্য ন্ত ক্রমাগত শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে উঠিয়ে বার বার আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে হৃদয় থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে শুনে বিস্মিত হয়েছি। অর্থাৎ শেষ সময় পর্যন্ত ক্রমাগত আলহামদুলিল্লাহ্ পড়তে থেকেছেন। তিনি বলেন,খোদার প্রতি তার ভালোবাসা দেখে আমার অন্তরে একপ্র কার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্র জ্জ্বলিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন এবং খেলাফতের প্রতি তার যেরূপ ভালোবাসা ছিল, সেরূপ যেন আমিও লাভ করতে পারি। আল্লা হ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার পু ণ্যসমূহ চলমান রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা রাবওয়া নিবাসী আমীর খান ভাট্টি সাহেবের পুত্র শরীফ আহমদ ভাট্টি সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি অষ্টআশি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম ওসিয়্যতকারী ছিলেন। নিজ অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও তিনি তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক ছেলে হিফাযত মরকযে কাজ করছেন। দ্বিতীয় ছেলে তাহের আহমদ ভাট্টি মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে সিয়েরালিয়নে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন।

তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ্ তাহের ভাট্টি সাহেব লিখেছেন, আমার পিতা বলতেন, পণ্ডিত লেখরামের নিহত হওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হয় তখন তার পিতা মোহতরম আমীর খান ভাট্টি সাহেব স্বল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াতে তাঁর হৃদয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা জায়গা করে নেয়। কিন্তু স্বল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে কাদিয়ান যাওয়া এবং বয়আত করা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তিনি লালিয়াতে থাকতেন।

১৯৭৪ সালে যে নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং বৈরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে সেখান থেকে রাবওয়া চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। টেক্সটাইল মিলে তিনি চাকু রি করতেন। কখনো আহমদীয়াতের বিষয়টি গোপন রাখেন নি। যেখানেই যেতেন সেখানে প্রথম দিনই লোকদের বলে দিতেন যে, আমি একজন আহমদী; আমার সাথে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তো রাখো, আমি তো আহমদী হিসেবেই নিজের পরিচয় দিব।

তার ভাই লতীফ আহমদ সাহেব জার্মানীতে থাকেন। তিনি বলেন, আমার ভাই টেক্সটাইল মিলে চাকরি করতেন। এক আহমদী-বিদ্বেষী তার ডিপার্টমেন্টে আসে আর বলে, আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি আহমদী। তিনি বলেন, ঠিক শুনেছেন, আমি একজন আহমদী সদস্য। সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বাজে কথা বলা শুরু করে এবং আরো বলে, এই মিলে হয় তুমি থাকবে নতুবা আমি। আর সে মিলের মালিকদের উস্কে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তখন তিনি দোয়া আরম্ভ করেন যে, হে আল্লাহ্! তোমার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোহাই, আমাকে সাহায্য করো এবং এই দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিকে ব্যর্থ করে দাও। তিনি বলেন, কিছুদিন পর একজন শ্রমিক এসে তাকে বলে, যে ব্যক্তি আপনার সাথে অশোভন আচরণ করছিল, সে মিলের বাইরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে আছে আর মিলের মালিক একটি লেনদেনে তাকে চুরির সাথে সম্পৃক্ত পেয়েছে এবং তাকে মিল থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

তিনি ছিলেন তাহাজ্জুদগুযার, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায আদায়কারী এবং সদা দোয়ায় মশগুল থাকতেন। জামা'তের বই পুস্তক অধিক হারে পাঠ করতেন আর অবসর গ্রহণের পর তো আরো বেশি পড়া আরম্ভ করেন। সর্বদা জামা'তের কোনো না কোনো বই তাঁর বালিশের পাশে থাকতো এবং তিনি তা পাঠে মগ্ন থাকতেন। যখনই যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে কোনো দোয়ার আহ্বান করা হতো, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই দোয়া পাঠে মগ্ন হয়ে যেতেন। অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তাঁর (মুরব্বী) ছেলে বলেন, আমি যখন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম তখন আমাকে আব্বা বলতেন, স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। ভাট্টি সাহেব নিজের পন্থা ছেলেকে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দিনে হাজার বারের অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহ্ তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচারণ করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর পুণ্য অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের যিনি নবাবশাহ জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। ৯২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন।

তাঁর এক পুত্র ও পাঁচ জন কন্যা সন্তান রয়েছে। তাঁর ছেলে সামার আহমদ লেখেন, তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতা মরহুম রঈস মুহাম্মদ মুকীম খান ডাহরী সাহেবের মাধ্যমে। আব্দুল কাদের সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। তার ছেলে লেখেন, সমাজের নিষ্পেষিত শ্রেণির সাথে ওঠাবসা করতে কোনোরূপ লজ্জাবোধ করতেন না। সেখানে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে পাশাপাশি বসানোকে অনেক বড় দূ ষণীয় বলে গণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ধি ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সে-যুগে সিন্দু প্রদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি ছিল। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকায় হায়দ্রাবাদের একটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার আগ্রহ দেখে সেখানকার প্রিন্সিপাল তাকে বলেন, নবাবশাহ-এ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করুন এবং সেখানে সান্ধ্যকালীন ক্লাস শুরু করুন। সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান বেশ উন্নতি করে আর তার পরিশ্রমের কারণে একসময় তা কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং সিন্দুর প্রসিদ্ধ কলেজগুলোর মাঝে সেটি পরিগণিত হতে থাকে। তেমনিভাবে সিন্ধু প্রদেশের বড় বড় সকল রাজনৈতিক পরিবারের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল আর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিতেন যে, আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। নিজ সন্তানদেরকেও বলতেন যে, কখনো ভয় পেয়ে নিজ আহমদীয়াতের বিশ্বাস গোপন করবে না। সিন্ধী ভাষায় সবসময় বলতেন যে, আমরা তো আহমদীয়াতের অলঙ্কার পরিধান করে রেখেছি যা এক সম্মানসূচক নিদর্শন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সিন্ধী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন এবং তাঁর (রাহে.) নির্দে শনা অনুযায়ী তফসীরে সগীরের সিন্ধী ভাষায় দুই খণ্ড সম্বলিত অনুবাদ করারও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। পবিত্র কুরাআনের অনুবাদ এবং নির্বাচিত আয়াতসমূহ সম্বলিত একটি লিফলেট ছাপানোর কারণেহযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ছাড়াও চারজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৯৫/সি ধারায় মামলা দায়ের করা হয় যাদের মাঝে তাঁর নামও অন্ত র্ভুক্ত ছিল। সিন্ধী ভাষা ছাড়াও উর্দু ভাষায় এতটা দক্ষতা রাখতেন যে, যাকে উদ্দেশ্য করেই লিখতেন সে-ই তাঁর লেখায় প্রভাবিত হতো। ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সদস্যও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডির ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতে আসতো। তাঁর বন্ধুবান্ধবের গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তিনি সিন্ধী ভাষায় একটি পুস্তকও রচনা করেছেন যেটি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও ছাত্র সকলের দিকনির্দেশনার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সিন্ধু র ডাহর গোত্র সম্পর্কেও অভিধানে বিরাজমান তথ্য যাতে হাস্যকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, কুরআনের শিক্ষা অনুসারে তিনি বিভিন্ন সরকারকে যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন আর অভিধান থেকে ঐসব হাস্যকর শব্দ তিনি বের করিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্য ধরে রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ওমর শরীফ খান সাহেবের যিনি ইদানিং আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তে কাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন।

১৯৩৯ সালে তানজানিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তাঁর পিতা ড. হাবীবুল্লাহ খান সাহেবের মাধ্যমে

খুতবার শেষাংশ শেষের পাতায়.....

(কুরআন) তিলাওয়াত করার পর এই বাক্য (সাদাকাল্লাহুল আযীম) পাঠ করে তাহলে এতে সমস্যার কিছু নেই। কেননা, এতে অবশ্যই মন্দ কিছু নেই বরং আল্লাহ্‌র কালাম সত্য হওয়ার সত্যায়ন করা হচ্ছে।

কিন্তু এই বাক্যের অর্থ না জেনে শুধুমাত্র একটি প্রথা হিসেবে এটি পাঠ করলে তা একটি অনর্থক কাজ বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু মুসাফিরের জন্য রমযানে রোযা না রাখার বিধান সম্পর্কে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে প্রেরণ করে এর পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা সম্পর্কে নির্দেশনা কামনা করেছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১১ই জুন, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: আপনার পত্রে বর্ণিত উভয় প্রকার বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উভয়েরই পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষার আলোকে এটিই বক্তব্য যে, মুসাফির এবং রোগীর রোযা রাখা উচিত নয়। আর কেউ যদি অসুস্থাবস্থায় এবং সফরের সময় রোযা রাখে তাহলে সে খোদা তা'লার সুস্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর (এই) বক্তব্য অর্থাৎ 'রোযার মধ্যে সফর আছে কিন্তু সফরের মধ্যে রোযা নাই' এর যতটুকু সম্পর্ক, যদি তাঁর পুরো খুতবাটি মনোযোগ দিয়ে পড়া হয় তাহলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হুযূর মূলত এখানে বিভিন্ন উপমা দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, এমন সফর যা রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে, সফরের জন্য মালপত্র বেঁধে সফরের নিয়্যতে করা হয় তা সে সফর যত ছোট বা সংক্ষিপ্তই হোক না কেন তাতে শরীয়ত রোযা রাখতে বারণ করে। কিন্তু এমন সফর যা বেড়ানোর উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ট্রিপ কিংবা Enjoyment (বা আমোদ-প্রমোদের) উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা রোযার নিরিখে বা মানদণ্ডে সফর বলে গণ্য হবে না এবং এসব ক্ষেত্রে রোযা রাখতে হবে। এছাড়া সফরে রোযা রাখা সম্পর্কে তাঁর (খলীফা সানী (রা.)-এর) অন্যান্য বক্তব্যও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করে।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন যে, (কোনো) মেয়ে তার বিয়ের প্রস্তাবে নিজেই অনুমতি দিতে এবং গ্রহণ করতে পারে কি? এছাড়া বিয়ের এলানের সময় দেন-মোহরের উল্লেখ করা আবশ্যক কি? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মুসলমান পুরুষদেরকে মু'মিন মহিলাদের সাথে এবং মুসলমান নারীদেরকে মু'মিন পুরুষদের বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন পুরুষদের জন্য বলেছেন, "লা তানকিহুল মুশরিকাত" অর্থাৎ তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করবে না। আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "লা তানকিহুল মুশরিকীন" অর্থাৎ তোমরা (নিজেদের মেয়েদের) মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিও না।

মোটকথা, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নারীদের ওলী বা অভিভাবকদের ওপর তাদের বিয়ের আয়োজনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একারণেই বিয়ের এলানের সময় কনের পক্ষ থেকে তার ওলী বা অভিভাবক অনুমতি দেয় বা গ্রহণ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "(একজন) মহিলা স্বয়ং নিজের বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অনুমতি রাখে না, যেভাবে সে স্বয়ং বিয়ে করার অনুমতি রাখে না বরং যুগের হাকেম বা প্রশাসনের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে, যেমনটি ওলী বা অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে করতে পারে।"

(আরিয়াধরম, পৃ. ৩১, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৭)

অতএব বিয়ের এলানের সময় অনুমতি প্রদান ও গ্রহণ করার দায়িত্ব পালন করবে কনের পক্ষ থেকে তার ওলী বা অভিভাবক আর এটিই জামা'তের রীতি বা ঐতিহ্য।

বিয়ের এলানের সময় দেন-মোহর উল্লেখ করার যতটুকু সম্পর্ক তা হল, এটি আবশ্যক নয়। কেননা পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান অনুসারে দেন-মোহর ধার্য করা ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। যেমনটি বলা হয়েছে,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا
لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আল্ বাকারা: ২৩৭) অর্থাৎ তোমাদের কোনো পাপ হবে না যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করা কিংবা তাদের জন্য মোহরানা ধার্য করার পূর্বেই তাদের তালাক দাও; তবে (এমন পরিস্থিতিতে) তোমাদের উচিত তাদেরকে যথোপযুক্ত কিছু উপকরণ বা সামগ্রী প্রদান করা; (এই কাজ) ধনীর জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্রের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী (অপরিহার্য)। (আমরা এমনটি করা) সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছি।

প্রশ্ন: গত ২৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে সুইডেন জামা'তের ন্যাশনাল আমেলার ভার্চুয়াল মোলাকাতের একদিন পূর্বে ইসলাম বিরোধী একটি দলের পক্ষ থেকে সুইডেনে পবিত্র কুরআনের একটি কপি পোড়ানোর কারণে ধিক্কার, এর কারণ এবং এ প্রেক্ষিতে একজন আহমদী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত- এ প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, প্রথমে তো শুনেছি যে, গতরাতে দাঙ্গাও হয়েছে। আপনাদের শহর বা এলাকায় আবার এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েনি তো? সুইডেনের শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবের উত্তরে বলেন, গতরাতে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন ইসলাম সম্পর্কে এই যে, ভুল ধারণা রয়েছে, এগুলো আপনাদেরকেই দূর করতে হবে। এখানে যে ব্যক্তি কুরআন পোড়ানোর জন্য দণ্ডায়মান হয়েছে, তাকে যদিও পুলিশ অনুমতি দেয় নি কিন্তু পাশাপাশি তাকে একথাও বলে দিয়েছে যে, তার আপীল করার অধিকার আছে। সে আপীল করতে পারবে। এছাড়া সেই ব্যক্তির যারা Followers বা অনুসারী ছিল কিংবা তার দলের যারা ছিল তারা গতকাল রাতে পার্কে গিয়ে পবিত্র কুরআন পুড়িয়েছিল। এমনটি কেন হচ্ছে?

এর কারণ হল, তারা জানেই না যে ইসলামের শিক্ষা কী? পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কী? আর মুসলমানদের যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তা তাদেরকে একথাই বলে যে, সম্ভবত এগুলো কুরআনেরই শিক্ষা। তারা (মুসলমানরা) একটি আয়াত আঁকড়ে ধরে যে, কিতাল করো অথবা যুদ্ধ করো। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য যে নির্দেশ রয়েছে যেমন, কোন অবস্থায় (যুদ্ধ) করবে, তা এদের কেউই জানে না। তাই এই শিক্ষা তাদের জানা উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আপনারা তবলীগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

প্রশ্ন: করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে তবলীগের কাজ কীভাবে করা যেতে পারে, একই মোলাকাতে এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: এখন অনেক বেশি অনলাইন তবলীগ আরম্ভ হয়ে গেছে। হোয়াটসঅ্যাপে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এখানে দেখুন যে, লোকজনের কাছে কী কী প্রশ্ন আছে? কোন কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে? বিভিন্ন সাইট বা প্লাটফর্ম রয়েছে সেখানে গিয়ে তাদেরকে বলুন যে, এই অবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অধিক বিনত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার দিকে আসা উচিত। তাঁকে চেনার চেষ্টা করা উচিত। নাস্তিক হয়ে খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আর এটাও মনে করা উচিত নয় যে, খোদা তা'লা দোয়া কবুল করেন না অথবা খোদা তা'লার অস্তিত্ব নেই কিংবা এই জগতই (আমাদের জন্য) সবকিছু। যদি এই পৃথিবীকে বাঁচাতে চাও তাহলে এগুলো করো। কেননা এরপর যে Crisis বা সংকট দেখা দিবে, এই ব্যাধির পর যখন অর্থনীতি Shatter বা ভেঙ্গে পড়তে থাকবে, এর পরের Crisis বা সংকট যা দেখা দিবে তা হল, (মানুষ) পরস্পরের সম্পদ হরণের চেষ্টা করবে, ফলে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হবে। আর এ জন্য বিভিন্ন ব্লক বা জোট হবে আর জোট বাঁধা আরম্ভ হয়ে গেছে। অতএব, এথেকে রক্ষার জন্য রীতি হল, খোদার দিকে আসো এবং নিজেদের দায়দায়িত্ব কী-তা অনুধাবন করো। কিন্তু যেসব প্রচার মাধ্যম রয়েছে, দুনিয়ার সাথে লোকদের যোগাযোগ তো হচ্ছেই, তাই না? এসব প্রচার মাধ্যম আপনারাও ব্যবহার করুন। আর সেই রীতি-পদ্ধতি আপনারাও অবলম্বন করুন যা জগতের (অন্য) লোকেরা করছে।

আমার ধারণা, আজ যেসব আলোচনা হয়েছে তার ওপরই যদি আপনারা আমল করেন, আর যেসব আবশ্যক বিষয় ছিল তা আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি যে, এই (ন্যাশনাল আমেলার) দায়দায়িত্ব কী? আর ন্যাশনাল আমেলার সাথে আমি যেসব কথা বলছি, অন্যান্য যেসব অঙ্গ-সংগঠন আছে এবং তাদের যেসব সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী আছেন, তাদের জন্যও একই নির্দেশনা। তাদেরও একথা স্মরণ রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের Policy বা কর্মপন্থা প্রণয়ন করতে হবে এবং (তা) কার্যকর করাতে হবে। যদি Grassroots Level বা তৃণমূল পর্যায়ে এসব কাজ করা আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে। আপনাদের অঙ্গসংগঠনের প্রত্যেক বিভাগের সংশ্লিষ্ট যেসব সেক্রেটারী আছেন, তারা যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন, (নিজেদের) দায়দায়িত্ব কী-তা অনুধাবন করতে পারেন তাহলে ন্যাশনাল আমেলার কাজও সহজ হয়ে যায় আর সেই উদ্দেশ্যও আপনারা সম্পাদনকারী হয়ে যাবেন যে জন্য কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করা হয় আর এভাবে আপনি যুগ-

খলীফার সাহায্যকারীও হয়ে যাবেন আর জামা'তের সেবার যে দায়িত্ব রয়েছে তা-ও যথাযথভাবে পালন করবেন আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতেও আপনাদের সেবা গৃহীত হবে। কিন্তু যদি শুধু পদ ধরে রাখতে চান এবং পদ পেয়েও কাজ না করেন এবং নিজের মন্দ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চান, দোয়ার প্রতি মনোযোগ না দেন, বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা না করে, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন বিভাগ এবং অঙ্গ-সংগঠনের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকে তাহলে এমন পদের কোনো লাভ নেই। এমন সংগঠনের কোনো মূল্য নেই। আর আপনারা চাইলে আমাকে ধোঁকা দিতে পারেন, অথবা জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে ধোঁকা দিতে পারেন কিন্তু খোদা তা'লাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। কাজেই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যেকোনো কাজ করার সময় সর্বদা মনে রাখবেন, খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ দেখেন এবং শোনেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমাদের সব কাজ করতে হবে আর এজন্য নিজের সকল যোগ্যতা, নিজের সকল Potentials ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমরা জামা'তের সক্রিয় কর্মীও হতে পারি আর যথাযথভাবে জামা'তের সেবাও করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হাফেয ও নাসের হোন, আমীন।

প্রশ্ন: একজন মহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেন যে, বিবাহিত জীবনের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি তিনবার তালাক হয়ে যায় তাহলে তৃতীয়বার তালাকের পর মীমাংসার পদ্ধতি কী হবে?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, 'আততালাকু মাররাতান' অত্যন্ত স্পষ্ট। যার অর্থ হল, এমন তালাক যার পর ফিরে আসার পথ রয়েছে, তা কেবল দু'বার হতে পারে। এরপর বলেছেন,'এমন দুই তালাকের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তৃতীয়বার তালাক প্রদানের পর সেই স্বামীর আর প্রাক্তন স্ত্রীর সাথে মীমাংসা করার কোনো অধিকার বাকি থাকে না।বিবাহ বহির্ভূতভাবে ইদ্দতকালীন সময়কালের মধ্যেও না আর ইদ্দত পালনের পর নিকাহ্‌র মাধ্যমেও সে তার সাথে সংসার করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মহিলা অপর কোনো পুরুষকে রীতিমত বিবাহ না করবে আর সেই স্বামী ঐ মহিলাকে কোনো (পূর্ব) পরিকল্পনা ছাড়াই তালাক না দেবে। কাজেই, আপনার বর্ণিত অবস্থায় এখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসার বা প্রত্যাবর্তনের আর কোনো পথ খোলা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে "যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মহিলা অপর কোনো পুরুষের সাথে রীতিমত বিবাহ না করে" -এই শর্ত পূর্ণ না হয়।

প্রশ্ন: জনৈকা মহিলা লিখেছেন, যদি কোনো অ-আহমদী মুসলমান আমার কাছে কোনো অ-আহমদী আলেমের লেখা তফসীর সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে আমার কোন্ তফসীর পড়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: পুরোনো বুযূর্গদের সকল তফসীর-ই উত্তম। আপনার জ্ঞাতার্থে কয়েকটি তফসীরের নাম লিখছি। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে লেখা তফসীরে তাবারী, যার পুরো নাম 'জামেউল বায়ান ফী তা'বীলুল কুরআন' আর এটি আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ বিন কাসীরুত্ তাবারী রচনা করেছেন।

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ফখর উদ্দীন ইবনে খতীব আর রাযী'র প্রণীত তফসীর কিন্তু 'তফসীরে কবীর' নামে সুপ্রসিদ্ধ। (এটি) খুবই উন্নত মানের তফসীর। সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে লিখিত তফসীরে নাম হচ্ছে, 'আল্ জামেউল আহকামুল কুরআন' তবে 'তফসীরে কুরতুবী' নামে এটি সুপরিচিত। প্রখ্যাত আলেম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর, ইমাম কুরতুবী নামে সুপরিচিত (তিনি) এই তফসীরটি রচনা করেছেন।

এছাড়া তফসীরে জালালাইন, তফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিও উত্তম এবং পড়ার যোগ্য তফসীর।

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু বিভিন্ন বন্ধুর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাস্য সেই প্রশ্ন সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দিকনির্দেশনা কামনা করেন যে, ঘানার পরিবেশকে দৃষ্টিতে রেখে যেখানে এমন অ-আহমদী ইমামও আছেন, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং আহমদীয়াতকে সত্য এবং সর্বোত্তম ইসলাম বলে মনে করেন এবং বিরোধিতা করেন না, কিন্তু কোনো অপারগতার কারণে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক পাচ্ছেন না। তাহলে এমন ব্যক্তি কিংবা ইমামের পেছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন,

উত্তর: সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অ-আহমদী ইমামের ইমামতিতে নামায পড়ার বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন আর সেখানে তিনি এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন, তাতে আপনার বর্ণিত বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। অতএব একদা এমন লোকদের সম্পর্কে আলোচনা হয়, যারা অস্বীকারও করে না আবার মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানও করে না এবং তাদের পেছনে নামায পড়ার মাসলা জানতে চাওয়া হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "তারা যদি কপটতার আশ্রয়ে এমনটি না করে যেমনটি বিভিন্ন মানুষের অভ্যাস হয়ে থাকে (মুসলমান হলে মুখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আর ব্রাহ্মণ হলে মুখে রাম রাম জপতে থাকে) তাহলে তাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত যে, আমরা অস্বীকারও করি না আর মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানও করি না (বরং তাঁকে বুযূর্গ, নেক ও আল্লাহ্‌র ওলী জ্ঞান করি) আর অস্বীকারকারীদের এজন্য কাফের জ্ঞান করি, কারণ তারা একজন মু'মিনকে কাফের বলে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে, তারা সত্য বলছে। নতুবা আমরা কীভাবে তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি আর কীভাবে তাদের পেছনে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে পারি। ফার্সী:(উচ্চারণ: গার হিফযে মরাতেব নাহ্ কুনী যিন্দিকী) নিজের অবস্থান পরিষ্কার না করলে তুমি বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত হবে।

নম্রতার সময় নম্রতা এবং কঠোরতার সময় কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত। ফেরাউনের মধ্যে এক প্রকার রুশদ বা পথ-প্রদর্শন ছিল আর সেই পথ-প্রদর্শনের কল্যাণেই তার মুখ থেকে সেই বাক্য নির্গত হয়, যা শতবার নিমজ্জিত হওয়া কাফিরের মুখ থেকেও নির্গত হয় না। অর্থাৎ ( )

অর্থ: 'আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই; যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে (সূরা ইউনুস: ৯১)। (তাই) তার সাথে নম্রতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো (সূরা ত্বাহা: ৪৫) আর অপরদিকে মহানবী (সা.)-কে বলেছেন,অর্থাৎ এবং তাদের প্রতি কঠোর হও (সূরা আত্ তওবা: ৭৩)। মনে হয় তাদের মাঝে একেবারেই পথ-প্রদর্শনের কোনোরূপ উপকরণ ছিল না। কাজেই, এমন আপত্তিকারীদের সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলা উচিত যাতে তাদের হৃদয়ে যে প্রচ্ছন্ন নোংরামি ও অপবিত্রতা রয়েছে তা বের হয়ে আসে এবং জামা'তের কোনো অপমান না হয়। (বদর পত্রিকা, নাম্বার ১৬, সপ্তম খণ্ড, ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৮, পৃ. ৪)

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক তওযীয়ে মারাম এর বরাতে চন্দ্র, সূর্য এবং তারকারাজিরওপর ফেরেশ্তাদের প্রভাব সৃষ্টি করা, মানুষের ওপর এসব জিনিসের প্রভাব সৃষ্টি করা এবং দৈহিকভাবে ফেরেশ্তাদের পৃথিবীতে অবতরণ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন,

উত্তর: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এই মূল্যবান রচনায় ফেরেশ্তাদের নক্ষত্ররাজির ওপর প্রভাব বিস্তার, আমাদের পৃথিবীর উদ্ভিদরাজি, প্রাণীকুল এবং জীবজন্তুর ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজির প্রভাব বিস্তার এবং মানুষের ওপর ফেরেশ্তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করা সম্পর্কিত বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতএব ফেরেশ্তাদের চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্ররাজির ওপর প্রভাব বিস্তার করা সম্পর্কে তাঁর বর্ণিত বিষয়ের সারমর্ম হল, খোদা তা'লার অনুমতিক্রমে ফেরেশ্তারা সেসব উজ্জ্বল নক্ষত্রের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ও সুনিয়ন্ত্রক আর এসব তারকা-নক্ষত্রের ওপর তাদের যে প্রভাব তা তাদের নিজেদের নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি এবং নির্দেশে হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় যে, সেসব পবিত্র নফস বা সত্তা যারা ফেরেশ্তা নামে পরিচিত, উর্ধ্বলোকের স্তরগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন। কেউ কেউ নিজেদের বিশেষ প্রভাবের আলোকে বায়ু প্রবাহিত করে, কতক বারি বর্ষণ করে আবার কতক অন্য কোনো প্রভাব পৃথিবীতে সৃষ্টি করানোর দায়িত্ব পালন করে।"

পুনরায় হুযূর (আ.) আরেকটি বিষয় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সেসব গ্রহ-নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির আমাদের পৃথিবীর উদ্ভিদরাশি, প্রাণীজগৎ এবং জীবজন্তুর ওপরে দিবারাত্রি প্রভাব পড়তে থাকে। কাজেই, আমরা দেখি যে, চাঁদের আলোয় ফল পুষ্ট হয়, সূর্যের গরম ও উত্তাপে ফল পাকে এবং মিষ্টি হয় আর কোনো কোনো সময় বায়ু অধিক ফলনের কারণ হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে হুযূর (আ.) এমনও একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন যে,

যেভাবে ফেরেশ্‌তারা খোদার নির্দেশে গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের পৃথিবীর বাহ্যিক উপকরণাদির ওপর গ্রহ-নক্ষত্র প্রভাব বিরাজ করে, একইভাবে ফেরেশ্‌তারা খোদা তা'লার নির্দেশে আমাদের মন-মস্তিষ্কে নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রভাবও বিস্তার করে। অতএব তিনি (আ.) বলেন,

"সত্যিকার অর্থে এসব বিষ্ময়কর সৃষ্টি স্ব স্ব স্থানে স্থিতিশীল এবং স্থির এবং খোদা তা'লার পরম প্রজ্ঞার অধীনে পৃথিবীর প্রত্যেক কার্যকর বস্তুকে তার পরম উৎকর্ষে পৌঁছানোর জন্য এরা আধ্যাত্মিক সেবায় রত রছেন। বাহ্যিক

সেবাও প্রদান করে থাকে আর আভ্যন্তরীণ সেবাও। যেভাবে আমাদের বাহ্যিক দেহ এবং আমাদের সকল বাহ্যিক শক্তিমত্তার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য তারকারাজির প্রভাব রয়েছে, অনুরূপভাবে আমাদের মন-মস্তিষ্ক এবং আমাদের সকল আধ্যাত্মিক শক্তিবৃত্তির ওপরে আমাদের বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী এসব ফেরেশ্‌তা স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করছে।"

ফেরেশ্‌তাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করার যতটুকু প্রশ্ন- এ সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমগ্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, ফেরেশ্‌তাদের পৃথিবীতে অবতরণ কখনও তাদের মূল সত্তাসহ হয় না। বরং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ফেরেশ্‌তারা মানুষের আকৃতি বা রূপ ধারণ করে তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের সাথে মেলামেশা করেন। বস্তুত, পবিত্র কুরআন এবং বিভিন্ন হাদীসে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এসব জ্যোতির্ময় সত্তারা কামেল বা পুণ্যবান বান্দাদের সামনে দৈহিক রূপে প্রকাশিত হন এবং মানব আকৃতিতে দেখা দেন।"(তৌযিয়ে মারাম, রুহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৬৮-৭২)

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এক মেয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপরে নির্মিত ডকুমেন্টারী বা প্রামাণ্য চিত্র Bloodline Of Christ' র উল্লেখ করে এতে বর্ণিত গল্পের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২১ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: এর পূর্বেও এ বিষয়ে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং বই-পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। এই প্রামাণ্য চিত্রে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরত করার কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু ফ্রান্স অভিমুখে তাঁর হিজরত করার কথা সঠিক নয়; কেননা ঐ যুগে ফ্রান্সে তাঁর অনুসারীদের কোনো দল ছিল না। বরং তাঁর গোত্রগুলো তো কাশ্মীর-অঞ্চলে ছিল, তাই ঐ দিকেই তিনি হিজরত করেছিলেন। যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টিকে তাঁর 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মে' পুস্তকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে গত ৩০শে আগস্ট, ২০২০ তারিখে খোদ্দামুল আহমদীয়া হল্যান্ডের ভার্চুয়াল মোলাকাতে একজন খাদেম তাঁর সমীপে নিবেদন করেন যে, বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে ফারমিং বা কৃষিকাজের প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: প্রশ্ন হল, পূর্বে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়, (তখন) তারা প্রত্যেক দেশে নিজ নিজ এলাকা ভাগ করে নেয় যে, তুমি ফল উৎপাদন করবে, তুমি Cropsবা শস্য উৎপাদন করবে, তুমি অমুক জিনিষ উৎপাদন করবে আর তুমি তমুক জিনিষ উৎপাদন করবে। কাজেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত খুবই ভাল কথা, তারা (সুন্দরভাবে নিজ নিজ কাজ) করতে থাকুক। এখন তারা হল্যান্ডের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তাদের কাছে Dairy Products বা দুগ্ধজাতীয় পণ্য অথবা ফলফলাদি রয়েছে। আর ফলফলাদিও বিশেষ প্রকারের। Pearsবা নাশপাতি ইত্যাদি এবং Something like that| Brexitএর মাধ্যমে ইউকে (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন) থেকে বের হয়ে গেছে, কিছুদিন পর এরা যখন পুরোপুরি বের হয়ে যাবে তখন ফলফলাদি আমদানির জন্যও এদেরকে সমস্যায় পড়তে হবে। এছাড়া Wheat Crisis বা গমের সমস্যাও দেখা দিবে আর এরা সমস্যায় নিপতিত হবে। তাই যুক্তরাজ্যের জন্য কৃষিকাজের প্রতি ঋড়পঁংকরা বা মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর এ খাতকে অনেক বেশি উন্নত করার চেষ্টা করুন। আর কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হোন। চাল-গম, শবজি এবং ফলফলাদির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হোন। আর ইউরোপের যতটুকু সম্পর্ক, তারা শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল, বরং তারা রপ্তানিও করে। একইভাবে ফলফলাদিও। কিছু সবজি আছে যা তারা Tropical বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল থেকে আমদানি করে। কেননা সেগুলো এখানে Greenhouses বানিয়ে উৎপাদন করা ছাড়া, সাধারণত এখানে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই নিজেদের দেশে যেসব জিনিস উৎপাদন করা সম্ভব তা এখানে করুন। ইউরোপ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে ভাল কথা। কিন্তু আগামীতে অন্য কোনো দেশ যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যায় তাহলে তারাও সমস্যায় পড়বে, ইংল্যন্ডের যেমন সমস্যা হচ্ছে। এরপর রাশিয়া যখন ঐকবদ্ধ ছিল তখন তারা নির্ধারণ করেছিল যে, অমুক প্রদেশে গম উৎপাদিত হবে, অমুক প্রদেশে সুতা উৎপাদিত হবে আর তমুক প্রদেশে রবিশস্য উৎপাদিত হবে। কিন্তু (রাশিয়া) যখন ভেঙ্গে যায় তখন তাদের প্রদেশগুলোকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তাই ঐকবদ্ধ থাকার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কোথাও যদি Chancese বা সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে আমাদের যারা রাজনীতিবিদ আছেন, তাদের (জোট থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তা করার পূর্বে নিজেদের লোকদের যে Staple Food বা প্রধান খাদ্য রয়েছে তা সরবরাহ করার বিষয়টিও চিন্তা করা উচিত যে, কীভাবে আমরা এগুলো সরবরাহ করবো আর এ লক্ষ্যে রীতিমত পরিকল্পনা করা উচিত। পরিকল্পনা ছাড়া (ইউনিয়ন) ত্যাগ করলে সেই অবস্থাই হবে, যা এখন যুক্তরাজ্যের হতে যাচ্ছে। কাজেই, পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর (বিষয়টি) খতিয়ে দেখা উচিত, (একত্রে) বসা উচিত, প্রণিধান করা উচিত যে, আমাদের গোটা ইউরোপের; আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত যে ২৬/২৭টি দেশ রয়েছে- তাদের চাহিদা কী? আর সেই চাহিদা অনুসারে প্রতিবছর আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন করা উচিত আর এই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় (তাও ভাবতে হবে)। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কথা ঠিক আছে যে, চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এরপরও যদি সংকট দেখা দেয়, আর সংকটের পরই যুদ্ধ বাঁধে। আর এক্ষেত্রে জানি না, কেউ যদি কোথাও পাগলামি করে আনবিক বোমা ব্যবহার করে বসে তাহলে না সেখানে চাষবাস থাকবে না-ই সেখানে অন্য কিছু থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'লাই রহম করুন।

প্রশ্ন: একই মোলাকাতে আরেকজন খাদেম হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, ছোট্ট শিশুদের তরবীয়তের জন্য কীভাবে এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে? এর উত্তরে হুযুর (আই.) বলেন-

উত্তর: আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছেন; শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকেই (তার) তরবীয়ত কর। এ কারণেই ইসলামে এই রীতি প্রচলিত আছে আর এটি সুন্নতও বটে। মহানবী (সা.)ও একথা বলতেন আর আমরা সে অনুযায়ী অনুশীলনও করি, অর্থাৎ যখন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন তার ডান কানে আযান দেই এবং বাম কানে তকবীর পাঠ করি। কারণ হল, তার কানে যেন (শুরুতেই) আল্লাহ্ তা'লার নাম প্রবেশ করে আর সে তৌহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রথম দিন থেকেই শিশুর তরবীয়ত শুরু করে দাও। এটি দেখো না যে, বাচ্চা এখনও ছোট, সে বুঝতে পারবে না। বাচ্চা ছোট হলে তাকে বুঝিয়ে বলো, তুমি কোনো জিনিস তাকে দিলে বলো যে, এটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। তোমার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে একথা সঞ্চার করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। আমাদেরকে তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই প্রথম কথা হল, আল্লাহ্র সত্তায় তার ঈমান বা বিশ্বাস সৃষ্টি করো অর্থাৎ, সে যা কিছুই পাচ্ছে তার ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লাই তার জন্য করছেন (একথা তাকে বুঝাও)। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহ্র সত্তায় তার ঈমান বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করবে। এরপর বলো, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সবকিছু দিচ্ছেন তাই আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে হবে। এরপর বলো যে, তুমি এখনও ছোট তাই তুমি (সবকিছু) জান না। তুমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এভাবেই পুরস্কাররাজি দিতে থাকেন, আমাদের প্রতি কৃপা করতে থাকেন। (এরপর বলো) আমরা বড় হয়ে গেছি বিধায় আমরা কিছুটা বুঝতে পারছি তাই আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সমর্পিত হই, নামায পড়ি। যেহেতু তুমিও বড় হয়ে গেছ তাই তুমিও নামায পড়া আরম্ভ কর। এরপর শিশু যখন সাত বছরে পৌঁছে তখন তাদের জন্য মহানবী (সা.) একথাই বলেছেন যে, তোমাকে নামায পড়তে হবে অথবা নামায পড়া ফরয। এরপর তাকে ধীরে ধীরে দুই, তিন কিংবা চার (বেলা), যতটুকু নামায বাচ্চা পড়তে পারে, সে যেন তা পড়তে থাকে। এরপর যখন ১০বছরের হয়ে যাবে, তখন মস্তিষ্ক বিকশিত হয়, তখন তাকে নামায পড়ায় অভ্যস্ত করো। কাজেই, প্রারম্ভিক যে তরবীয়ত তা-ই সন্তানের শেষ জীবন পর্যন্ত কাজে আসে। এছাড়া শিশুরা পবিত্র কুরআনও পাঠ করে। কিন্তু শিশুদের ওপর এতটা চাপও দিও না যে, তিন বছর বয়সেই তাকে কুরআন পড়ানো শুরু করে দিবে। এরপর চার বছর বয়সে সে ক্লান্ত হয়ে যাবে আর যখন এগারো বছর বয়সে পৌঁছবে তখন বাইরের পরিবেশে মিশবে এবং সে স্বাধীনতা লাভ করতে আরম্ভ করবে। তাই একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। শিশুকে বোঝাও,

এমন যত্নসহকারে নামায পড়ুন যাতে শিশুদের মনেও নামাযের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তারা যেন নামায পড়তে চায়।

তোমরা পর্দা করলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাব হবে- এটা বস্তুবাদি ও দাজ্জালি চক্রান্ত। শয়তানের কুমন্ত্রণা এগুলি, শিক্ষিত মানুষেরাও এই সব মন্ত্রণা দেয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ১২ই ডিসেম্বর কানাডায় বসবাসকারী আরব-বংশোদ্ভূত মহিলাদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতানুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব উপস্থাপন করা হল।

একজন লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার কি বাড়ির কাজকর্মে সাহায্য করেন? বিশেষ করে রান্নার কাজে? হুযুর কি ভাল রান্না করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি কি ভাল রান্না করি? আমি ভাল রান্না করি কি না এটা সেই বলতে পারবে যে আমার রান্না খেয়েছে। আমি বলব যে সব কিছু রান্না করতে পারি, কিন্তু মাঝে মধ্যে রান্না করতাম। সে কথা অনেক দিন আগের, অনেক দিন রান্না করি নি। সময়ই হয়ে ওঠে না। না আপনাদের থেকে ছাড় পাই না অফিসের কাজ থেকে আর না মানুষের চিঠি-পত্র পড়া থেকে সময় বের করতে পারির। কিন্তু তবু যদি কখনও সুযোগ হয়, কোন ছোট খাট কাজ করার, আর যদি প্রয়োজন হয় তবে করে থাকি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সব ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়, তাদের উচিত বাড়ির কাজে সাহায্য করা।

অপর এক সদস্যা প্রশ্ন করেন, আমরা কি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি এমন নিশ্চয়তা থাকে যে প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হবে এবং শেষমেশ তা ভাঙচুর প্রদর্শন ও সহিংসতায় পর্যবসিত হবে না, তবে করতে পারেন। এমন প্রতিবাদ আন্দোলনে কোন বাধা নেই। কাশ্মীরের অধিকার নিয়েও একবার হযরত খলীফা সানি (রা.)এর যুগে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। হযরত খলীফা সানি (রা.) তাতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। যদি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হয়, কোন ভাঙচুর প্রদর্শন না হয়,সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি না হয় এবং আইনের গণ্ডিতে থেকে হয়। এখানে, এই সব দেশের আইনও আন্দোলনের অনুমতি দেয়। আর শান্তিপূর্ণ সভা ও সমাবেশ হিসেবে আন্দোলন করতে পারেন। কোন অসুবিধা নেই।

লাজনা সদস্যাটি বলেন, আমার এক ফ্যামিলি ডক্টর রয়েছেন, যিনি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি ভিটামিন ডি গ্রহণ করি কি না। আমি বলেছি, হ্যাঁ নিই। তিনি বলেন, আপনাদের অন্যদের তুলনায় বেশি নেওয়া উচিত, কেননা, আপনারা হিজাব পরেন। যে কারণে সূর্যের কিরণ আপনাদের ত্বকে পৌঁছতে পারে না। আমার প্রশ্ন হল, খোদা তা'লা কি এমন কোন আদেশ দান করতে পারেন যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল, শীতকালে যখন ভিটামিন ডি-র অভাব বেশি করে দেখা দেয়, সাধারণত দিনও সেখানে নাতিদীর্ঘ। ইউরোপের মত পশ্চিমাদেশগুলোতে সেই সময় তারাও নিজেদের শরীর ঢেকে রাখে আর সেই সময় খুব বেশি সূর্যের দেখাও পাওয়া যায় না। সেই সময় তারাও তো ভিটামিন ডি খেয়ে থাকে। বাকি থাকল গ্রীষ্মকালের কথা। এই সময় আমাদের মুখমণ্ডল অনেকটাই অনাবৃত থাকে, তবু সূর্যের কিরণ সরাসরি তো আর মুখের উপর পড়ে না। এরা ভিটামিন ডি গ্রহণের নামে এবং সূর্যস্নানের নামে সমুদ্রতটে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকে। এটা তো অশ্লীলতার প্রসার ছাড়া আর কিছুই না। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। সূর্য কিরণের যতটা চাহিদা রয়েছে তা বস্ত্র পরিহিত অবস্থাতে বসে থেকেও পুরণ হয়ে যায়। আপনাদের মুখমণ্ডল তো অনাবৃত থাকে, হাত - পা অনাবৃত থাকে, তাতেই ভিটামিন ডি-র চাহিদা পুরণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ব্যবস্থাপনা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। তোমরা পর্দা করলে শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাব হবে- এটা বস্তুবাদি ও দাজ্জালি চক্রান্ত। সেই শয়তানের কথাই এখন হচ্ছিল। শয়তানের কুমন্ত্রণা এগুলি, যা শিক্ষিত মানুষেরাও এই সব মন্ত্রণা দেয়। এটা হল বাইরের শয়তান। তাই আপনাদের যতটুকু চাহিদা তা পুরণ হয়ে যায়। এছাড়া বাড়িতে সারা দিন তো আপনি হিজাব পরিহিতা থাকেন না। বাড়িতে আপনার ঘরের জানালা দিয়ে রোদ আসে, যেখানে রোদ আসে আপনি বসে বসে রোদ পোহাতে পারেন। বাড়িতে তো আপনারা হালকা-পাতলা কাপড় পরে থাকেন, আর হিজাব বা কোট পরার বা পর্দা করার নির্দেশ রয়েছে বাইরে যাওয়ার জন্য। বাড়িতে যদি কোন না-মহররম থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। অন্যথা নিজের সুবিধা মত কাপড়ে থাকতে পারেন। আর বাড়িতে মাথায় ওড়নাও তো থাকে না। বেশ ঢিলে-ঢালা পোশাক থাকে, কেউ যদি অর্ধেক কামিস পরে থাকে, সেটাও যথেষ্ট সূর্যের আলো গ্রহণের জন্য। যে একথা বলেছে যে, সূর্যের কিরণ না পাওয়ার কারণে ভিটামিন ডি- সেবন করুন, সে একেবারেই ভুল বলেছে। বরং এরাও অনেক বেশি পরিমাণে ভিটামিন ডি সেবন করে থাকে। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে প্রাকৃতিকভাবেই ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। সেখানে তেমন কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন: আমরা সন্তানদের হৃদয়ে খোদা তা'লা এবং নামাযের প্রতি ভালবাসা কিভাবে সঞ্চারিত করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদের সামনে নামায পড়ুন, আর এমন যত্নসহকারে নামায পড়ুন যাতে শিশুদের মনেও নামাযের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তারা যেন নামায পড়তে চায়। আমি দেখেছি, অনেক মা-বাবা নিজেরা বাচ্চাদের সামনে নামায পড়ে। মেয়েরা দেখে দেখে নিজে থেকে স্কার্ফ পরে বা ওড়না মাথায় দিয়ে মায়েদের সঙ্গে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যায়। কিম্বা ছেলেরা মাথায় টুপি দিয়ে নামায পড়তে শুরু করে বা এমনিই নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাই শৈশব থেকেই যদি আগ্রহ তৈরী হয়, তাদের মধ্যে এই চেতনা তৈরী হয় যে এটা তাদের কর্তব্য বা অবশ্য পালনীয় কাজ যা তার মা-বাবা পালন করছে আর এই কাজে তারা আনন্দ পায়, আপনাদের মুখ দেখে তারাও বুঝতে পারবে যে আপনাদের মধ্যে নামাযের প্রতি ভালবাসা রয়েছে আর এটা এমন কাজ যা কখনও আপনারা ছেড়ে দেন না, তখন শৈশব থেকেই তাদের মনে ভালবাসা ও আগ্রহ তৈরী হবে। এটা তো মানুষের নিজের দৃষ্টান্ত, শিশুদের সামনে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত থাকলে তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে আর বড় হওয়া পর্যন্ত সেই আগ্রহ যদি ধরে রাখেন, তবে সাত বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এই আগ্রহ তৈরী হয়ে যাবে।এই কারণে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, সাত থেকে দশ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে নামায পড়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন। এর আগে তো নামায পড়ানোর জন্য বলেন নি, কিন্তু নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বলেছেন। এরপর তিন বছর নামায পড়ার জন্য বলুন, বা এক, দুই বা তিন চারটি নামায তারা পড়ুক। এরপর দশ বছরের পর নামায তাদের জন্য ফরয হয়ে যায়। তখন তাদেরকে বলুন, তোমাদের জন্য নামায ফরজ, তোমরা এখন বড় হয়ে গেছ, নামায পড়তে হবে। এটাই হল মা-বাবার দৃষ্টান্ত স্থাপনের দায়িত্ব। খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি আপনাদের নিজেদের কতটা ভালবাসা রয়েছে এবং কতটা তা পূর্ণ করতে পারছেন? যখন নিজেরা সঠিক অর্থে নামায পড়বেন, এবং সন্তানের পিতাও নামায পড়বে, তখন নিজে থেকেই অভ্যাস গড়ে উঠবে। বুঝতে পেরেছেন তো? না কিছু থেকে গেল? প্রশ্ন থাকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

লাজনা সদস্যা বলেন, আমার ছেলের বয়স এগারো বছর। সে আমাদের সাথে নামায পড়ে। আর আমাদের মেয়ের বয়স তিন বছর, সে হিজাবও পরে। কিন্তু সে কখনও ওজু করে না, এমনিই দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি ছেলেকে বলি, ওকে পড়তে দাও। কিন্তু সে বলে, তুমি ওকে এমনটি করতে দাও, আমাকে দাও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাকে বলুন, তোমার বোনের জন্য নামায এখনও ফরজ হয় নি। সে যদি নিজের আগ্রহে নামাযে অংশ গ্রহণ করে তো করতে দাও। এই বয়সে ওর উপর এখন থেকেই কড়াকড়ি করব না। ইসলাম হল সরলতা ধর্ম, কঠোরতা করার নির্দেশ দেয় না। কিন্তু তুমি যেহেতু এগারো বছরে উপনীত হয়েছ, তাই নামায সংক্রান্ত যা কিছু ইসলামি বিধিনিয়ম রয়েছে সব কিছুই তোমার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- নামাযের পূর্বে ওজু করা, নামাযের জন্য দাঁড়ানোর যথাযথ নিয়ম মেনে চলা-এগুলি যেহেতু তোমার জন্য ফরজ হয়ে গেছে, তাই তোমাকে আমরা করতে বলি। তোমার বোনের জন্য এখন ফরজ হয় নি। যখন সে এগারো বছরের হয়ে যাবে, বা সাত বছরের হবে,বা দশ বছরের হবে, তখন আমরা তাকেও এগুলি করতে বলব। সাত বছর বয়সে অভ্যাস করতে শুরু করব, ইনশাআল্লাহ্ যখন দশ বছরের হবে, তখন তাকেও আমরা বলব। তুমি চিন্তা করো না। তার প্রতি আলাদা আচরণ করা হচ্ছে, এমনটা নয়। শৈশবে তোমাকেও আমরা এসব করতে বলতাম না, তোমার বোনকেও বলি না। যখন সে তোমার বয়সে পৌঁছবে, তখন তাকেও বলব। এইভাবে আপনার ছেলেকে স্নেহসহকারে বোঝাতে পারেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান — Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 — Vol-8 Thursday, 16 Nov, 2023 Issue No.46

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর......)

আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান সৃষ্টি কর, ইসলামের সত্যতার প্রমাণ দাও। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এ যুগে ধর্মের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর কথা (শিশুকে) বল। ছোট-ছোট গল্প শুনিয়ে, সাহাবীদের ছোট-ছোট ঘটনা শুনিয়ে, নবীদের বিভিন্ন ঘটনা শুনিয়ে, মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপা রয়েছে সেসব গল্প শুনিয়ে, তোমার প্রতি খোদার যে কৃপা বর্ষিত হয়েছে তা শুনিয়ে (শিশুর) মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি কর। এভাবে (ধর্মের প্রতি বা আল্লাহ্‌র প্রতি) এক প্রকার ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। সৎ উদ্দেশ্যে যদি পিতামাতা সন্তানকে বোঝাতে থাকে, ধর্মের দিকে টানতে থাকে তাহলে তারা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে আর তখন খোদার প্রতি তাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে আর নামাযের প্রতিও মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পাঞ্জাবীদের মত একথা বলা যে, বাচ্চাদের ছেড়ে দাও, বড় হলে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে- এমন করা ঠিক হবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, প্রথম দিন থেকেই সন্তানের তরবীয়ত কর। তাই 'বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে' এমন কোনো কথা নেই। সন্তানের বয়সের সাথে সাথে তার তরবীয়ত কর এবং (তার সামনে) নিজের আদর্শ দেখাও।

প্রশ্ন: ৩০শে আগস্ট, ২০২০ সালের খোদ্দামের এই ভার্চুয়াল মোলাকাতেই আরেকজন খাদেম হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, একজন খাদেমের প্রতিদিন কমপক্ষে কোন্ কাজ করা উচিত? এর উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন,

উত্তর: একজন খাদেমকে প্রতিদিন কমপক্ষে সময়মতো পাঁচবেলার নামায পড়া উচিত। ফজরের সময় উঠে ফজরের নামায পড়। আর নামায সেন্টার কিংবা মসজিদ যদি নিকটে থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে বাজামা'ত পড়। আর কাজ শেষে মাগরিব এবং এশার নামাযও নামায সেন্টারে গিয়ে পড়। কর্মক্ষেত্রেও যোহর ও আসরের নামায পড়। পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়, কেননা এটি মৌলিক নির্দেশ। এটি প্রতিদিনের দায়িত্ব, এই কাজ কর। শুধুমাত্র ঠোকর মারবে না। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ তাই আমাকে নামায পড়তে হবে, তাহলে (তোমার মাঝে) অন্যান্য নৈতিক গুণাবলীও সৃষ্টি হবে। যখন নামায পড়বে তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করবে যে, অর্থাৎ, আমাকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত কর। আর এই দোয়া যখন হৃদয় থেকে উদ্ভুত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আধ্যাত্মিকভাবেও সীরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করবে, সঠিকভাবে গাইড করতে থাকবেন আর তুমি সঠিক পথ থেকে এদিক-সেদিকে উবারধঃববা বিচ্যুত হবে না। আর যেসব নীতি-নৈতিকতার কথা আল্লাহ্ তা'লা বাতলে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার যে শিক্ষা তার ওপরও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। এরপর যখন বলবে তখন জানা কথা যে এই দোয়াই করবে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করতে চাই আর তোমার কাছেই সাহায্য যাচনা করি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। তাদের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর যাদেরকে তুমি শাস্তি দিয়েছ এবং যারা সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। কাজেই তাঁর রহমানিয়্যাত যাচনা কর। তাঁর রহিমিয়্যাত কামনা কর। এরপর যখন গভীর মনোযোগের সাথে নামায পড়বে তখন শুধুমাত্র জাগতিক বিষয়াদিই যাচনা করবে না, পরকালের কল্যাণও যাচনা কর। একজন খাদেম যখন গভীর মনোযোগের সাথে নামায পড়বে তখন জেনে রেখ, সে সব কিছুই করে ফেলেছে।

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

(খুতবার শেষাংশ....)

যিনি তানজানিয়াতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। শরীফ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ান থেকে লাভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ১৯৫৪-৫৫ সালের খুতবার কল্যাণে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণ পদকসহ প্রাণীবিদ্যায় এম.এসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৯৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীবিদ্যায় পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে ৩৫ বছর সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রফেসর সাহেবের প্রায় ২৫০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল সরীসৃপ প্রাণী। তিনি অনেক গবেষণা করতেন। সাপ, টিকটিকি ও কীটপতঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

আমিও তাঁর ছাত্র ছিলাম। আমাদের পুরো ক্লাসকে তিনি বাইরে নিয়ে যেতেন আর দেখাতেন যে, প্রকৃতিতে কেমন ও কোন ধরনের প্রাণী, কীটপতঙ্গ বিদ্যমান।

২০০২ সালে পাকিস্তানে তাঁকে বছরের সেরা প্রাণীবিদের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

আমেরিকার মুজিবুল্লাহ্ চৌধুরী সাহেব লেখেন যে, ২০০৮ সালে আমি তার সাথে মসজিদের চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে কথা বলি। তখন তিনি বলেন, আমাদের কাছে দেওয়ার মতোতেমন কিছু নেই, তবুও বাসায় আসুন। বাসায় গেলে তার স্ত্রী আসেন আর একটি থলে বের করে সামনে রেখে দেন যাতে ছিল তার পিতামাতা বা শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণালঙ্কার; তিনি বলেন, এগুলোই আমাদের কাছে আছে, নিয়ে যান। অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। ছাত্রদের সাথে সবসময় হাসিখুশি আর বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

তাঁর বড় ছেলে জাফরুল্লাহ সাহেব লিখেছেন, (পরবর্তীতে কিছু কথা এসেছে,) আমেরিকা ও কানাডা থেকে কিছু বিজ্ঞানী রাবওয়ায় প্রফেসর ড. শরীফ খান সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই বিজ্ঞানীদের মতে, সরীসৃপ বিদ্যায় পাকিস্তানে শরীফ খান সাহেবের থেকে অধিক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ নেই। তিনি অনেক বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তাঁর পুত্র রাশেদ যুবায়ের সাহেব বলেন, যৌবন থেকেই তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত এবং নামায-রোযায় নিয়মিত ছিলেন আর মসজিদে কমর-এ নামাযের ইমামতিও করতেন। বাজামা'ত নামায আদায় ছাড়াও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং তফসীর পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল আর তার পড়ালেখার গণ্ডিও ছিল ব্যাপক।

তাঁর পৌত্র মাশহুদ আহমদ খান বলেন, আমাদের দাদা অনেক আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তিনি সময়মতো নামায আদায় করা এবং কুরআন করীম পাঠের প্রতি গভীর মনোনিবেশের দিকে বিশেষ তাগিদ দিতেন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে অনেক বেশি ভালোবাসা ছিল তার আর সর্বদা যুগ-খলীফার কাছে পত্র লিখতেন আর খুতবা শোনার প্রতি নিজেরও মনোযোগ ছিল আর ঘরের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার বংশধরদের মাঝেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir